# বৃষ্টি অবৃষ্টি

সুকান্তি দত্ত

করুণা প্রকাশনী ।। কলকাতা-৯

**প্রথম প্রকাশ :**
অক্টোবর- ১৯৫৬

**প্রকাশক :**
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

**অক্ষর-বিন্যাস :**
রীতু ডি. টি. পি. সেন্টার
সাউথ গরিয়া
দঃ ২৪ পরগনা

**প্রচ্ছদ-শিল্পী :**
দেবাশীষ রায়

**মুদ্রাকর :**
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কোলকাতা-৬

সময়ের জ্বলন্ত তিমিরে,
তুমিই আছ শুধু
হৃদয়ের অনিঃশেষ জ্যোৎস্নায়
কত সহজ গভীর অনায়াসে!

কুমু, কস্তুরী
তোমাকে

ঝিরঝির বৃষ্টি। বাজারের মোড়ে সন্ধের জমজমাট ভিড় ছত্রখান হয়ে গেল। এলোমেলো হাওয়াও আছে। সারাদিন ঝাঁ ঝাঁ রোদ শুষে নেওয়া বাতাস থেকে যেন স্বেদ ঝরে পড়ছে।

পাতলা ঘুমঘোরের ভেতর এসব আবছা দেখতে পায় নির্ঝর। দেখতে দেখতেই ভিজতে থাকে বৃষ্টিতে।

সুজনডাঙা বাজারের উত্তরদিকে তিন রাস্তার মোড়, তিরানব্বুই ডি বাস টার্মিনাস্। যে রাস্তা আরও উত্তর থেকে আসছে সেটাই সরু হয়ে গেছে আর দু'পাশ দিয়ে শুরু হয়েছে বাজার। ঢোকার মুখে প্রথমে পরপর কয়েকটা মুদি দোকান, তারপর বাসনপত্র, টেলারিং, সেলুন, দশকর্মা। কাঁচাবাজার আরেকটু ভেতরে। পুবদিকে অবশ্য বাজার খুব বেশি বাড়েনি। ওদিকে দু-চারটে দোকানের পরই রেললাইন, লেভেল ক্রসিং।

চুলে, মাথায়, দু'হাত বাড়িয়ে তালুতে বৃষ্টি মেখে নিতে নিতে মোড় জুড়ে দু-একবার এলোমেলো চক্কর মেরে সে কি কয়েক পা হেঁটে যায় লেভেল ক্রসিং-এর দিকে? আরও ফিকে হয়ে আসে ঘুমঘোর, বৃষ্টিজলে শীতবোধ করে কি? পাশ ফেরে, হাঁটু-ভাঁজ করে শরীরটাকে কুঁকড়ে নিয়ে সে শুনতে পায় কেউ কিছু বলছে, সুজনডাঙা বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে কে যেন চিৎকার করে কিছু বলছে, কে? সে শুনতে চেষ্টা করে, শুরু হতে হতে শেষ হয়ে যায় কথাগুলো, বাতাসে মিলিয়ে যায়, শেষ হতে হতে আবার শুরু হয়, অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতায় আসে, স্পষ্টতা থেকে অস্পষ্টতায়, বৃষ্টি ফোঁটার মতো মিশে যায় মাটিতে, বাতাসে উড়ে যায় বহুদূরে, কথক কে চিনতে চেষ্টা করে সে, বৃষ্টি বাড়ে।

কে? আস্তে আস্তে চোখ খোলে নির্ঝর। ঘরের অন্ধকারে ফ্যানের বাতাসের সঙ্গে কয়েক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের জড়াজড়ি। সেই বাতাসের ভেতর এখনও যেন কথাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে। রাত কত এখন? আড়াইটে? তিনটে? ফ্যানের সোঁ সোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে দূর থেকে রেলইঞ্জিনের হর্ন। তারপর কি কোকিলের ডাক? কোকিল না কি অন্য কোন রাতচরা পাখি? আরেকবার শুনতে চেয়ে চুপচাপ কান পেতে রাখে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত গড়িয়ে যায়, ভেসে আসে রেলইঞ্জিনের কাটা কাটা হুইশিল।

আজও কি ঘুম হবে না? পেটের ভেতর জ্বালা, বেশ জ্বালা। দু-তিন গ্লাস জল খেয়ে একটু পায়চারি করে নেব কি? ভাবতে ভাবতে চিত হয়ে শুয়ে ডান হাতের কনুই ভাঁজ করে আড়াআড়ি মেলে দেয় কপালে।

সুজনডাঙা বাজারের মোড়ে কে বলছিলেন কথাগুলো, শরৎবাবু? হ্যাঁ শরৎবাবুই, অখণ্ড বাংলা তথা ভারত গড়ার চেষ্টা ভেঙে যাওয়ার পর মৃত্যুর দশ মিনিট আগে তিনিই তো লিখেছিলেন—ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশ বিভাজন সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সমাধান নয়...

আচ্ছা, সুজনডাঙা নিয়ে আমার লেখাটা যদি এভাবেই শুরু করি—বৃষ্টিভেজা বাজারের মোড়ে আমার হেঁটে বেড়ানো আর শরৎবাবু, শরৎবাবুর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, লক্ষ

লক্ষ শরণার্থীর চোখের জল আর অভিশাপ—তা কি এক ঘটনা না হয়ে দুর্ঘটনা হয়ে যায়? কয় কী ব্যাটা, যুক্তি শৃঙ্খলা কার্যকারণ সব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সুজনডাঙা বাজারের মোড়ে শেষে কী না শরৎবাবু! যে কোনো দুর্ঘটনাই তো অস্বাভাবিক, এক অর্থে অবিশ্বাস্য অবাস্তব, এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্যের পেছনে যদি কোনো ঈশ্বরের ভূমিকা মানতে না চাই তা হলে এক আকস্মিক দুর্ঘটনার ধারণাই এসে যায় না কি? আবার উপনিষদ বা হকিং সাহেবের মতো যদি বলি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো শুরু বা শেষ নেই, তা হলেও যে কোনো শুরু বা শেষই তো এক অর্থে দুর্ঘটনা, তা জীবনেই হোক আর জীবন ঘিরে লেখাতেই হোক।

বাইরে বৃষ্টি, শীত করে নির্ঝরের, ফ্যান অফ করতে বিছানার ডান ধারে গড়িয়ে এসে মশারির ভেতর থেকেই বেড সুইচে চাপ দেয়। বেশ বড়ো বিছানা তার, বিশাল বপু না হলে তিনজন লোক মোটামুটি রাত কাটিয়ে দিতে পারে, একজনের পক্ষে বড়ো বৈ কী। প্রায় চল্লিশটা বর্ষা শীত গ্রীষ্ম একা একাই কাটিয়ে দিল সে এই বিছানায়, না, একটু ভুল হল, বছর বারো বয়েস থেকে সে বোধহয় এই খাটে একলা শুচ্ছে, তা হলেও আঠাশ বছর তো হল।

চল্লিশ বছর! বড় বেহিসেবি চালে এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল বাউণ্ডুলের মতো এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলাম, ছোটবেলায় বাপ-হারানো থেকে শুরু করে গোটা জীবনটাই যেন এ পর্যন্ত অসংখ্য দুর্ঘটনারই জোড়াতাপ্পি! জীবন কী, কেন, বাঁচা মরার মানে খুঁজতে খুঁজতেই, জীবনের নানারকম অমৃত গরল জেনে বুঝে নেওয়ার তাড়নাতেই কেটে গেল এতগুলো বছর, শুধু সংশয়, সংশয় আর প্রশ্ন, এক প্রশ্নের উত্তরের পিছু পিছু তাড়া করে ছুটে আসা আরেক প্রশ্ন, কেমন এক গোলকধাঁধার ভেতরেই অন্তহীন ছুটে বেড়ানো।

বেশ টানটান হয়ে শুয়ে, বারকতক জোরে প্রশ্বাস নিয়ে, সুস্থিরভাবে ফেলে আসা জীবনের দিকে একনজরে বুলিয়ে নিতে চেষ্টা করে নির্ঝর।

মাধ্যমিকে তিনটে লেটার সহ ফার্স্ট ডিভিসন জুটেছিল বটে কিন্তু তারপর থেকেই বেয়াড়া বেআক্কেলে জীবনযাপন, বন্ধু তালিকায় ব্যাঙ্কডাকাত থেকে খ্যাতনামা কবি বিপ্লবীও ছিল দু-চারজন, গাঁজা চরস চুল্লুর নেশাবিপ্লব থেকে ভারতবর্ষের মেহনতী জনতার অসম্পূর্ণ বিপ্লবের কর্মসূচি পর্যন্ত সব কিছুর ভেতরেই একেবারে জলের মধ্যে মাছের মতো সেঁধিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। পেশা হিসেবেও জীবনে কম কাজ করিনি, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, কেজি স্কুলে শিক্ষকতা, প্রিন্টিং প্রেসের অর্ডার সাপ্লায়ার, প্রুফ রিডার থেকে ট্যুইশন তো ছিলই। তবে যত সময় কাজ করেছি তার থেকে বেশি সময় বেকার থেকেছি। এক কাজ একটানা কয়েক মাস করলেই আমার দম আটকে আসে, মনে হয় আমায় যেন একটা গুপ্ত কুঠুরির মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তখন কেমন এক নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা ছেয়ে ফেলে, ঠিক কেন, কী জন্যে বেঁচে থাকে মানুষ এবং পেট

ভরানোর জন্যে এত সময় কোনো কাজে দেওয়া উচিত কি না এসব ভাবনা কিলবিলিয়ে ওঠে, আর ততই কাজে উৎসাহ কমে আসে।

ভাবতে ভাবতেই নির্ঝরের বুকের ভেতর অবৃষ্টির শীতল হাহাকার চুঁইয়ে পড়ে, যদি কোন ঈশ্বর থেকে থাকেন, হঠাৎ যদি এখন তাঁর দেওয়া জীবনটুকু ছিঁড়ে নেন তিনি, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কী অনুযোগ জানাব আমি, যদি তিনি বলেন চল্লিশ বছর দিব্যি রোদে হাওয়ায় জলে ঝলমলে পাখির মতো উড়লি যে তুই, করলি কী? কী উত্তর দেব আমি?

বিছানা ছেড়ে নেমে আলো জ্বালে। টেবিলের কাছে গিয়ে জগ থেকে বেশ ঢকঢক করে দু'গ্লাস জল খেয়ে আলনায় ঝোলানো জামার পকেট থেকে বিড়ি বের করে। দেশলাই সন্ধানে এদিক ওদিক হাতড়াতে হয় অনেকক্ষণ। খুঁজে পায় টেবিলে জমা বই খাতার স্তূপের ভেতর।

না, সত্যি সত্যি কোন ঈশ্বর বিশ্বাস নেই তার, ঈশ্বর কেন, কোন কিছুকেই ঘিরেই ধ্রুব বিশ্বাস তার মনে শক্তপোক্ত ঘাঁটি গাড়তে পারেনি, যদিও ইদানীং সে তার এই অবিশ্বাসী মনকেই নানা সংশয়ে বিদ্ধ করতে চাইছে, সে কি কিছুটা বয়েস হয়েছে বলে? একটা স্থির বিশ্বাসের ভূমিকে আঁকড়ে ধরে বাকি জীবনটুকু শান্তি স্বস্তিতে কাটিয়ে দেওয়া যাবে বলে? এরও কোনো স্পষ্ট উত্তর অবশ্য নেই তার কাছে। কথাটা ভেবে খাঁ খাঁ রোদ্দুরের মতো বেশ খানিকটা হাসির দমক পেটের ভেতর থেকে হিসহিসিয়ে উঠতে চাইল, শান্তি স্বস্তি এইসব শব্দগুলোও কেমন তার বেহিসেবি জীবনের মধ্যে এখন জায়গা করে নিতে চাইছে! ফিরে দেখলে বোধহয় এ জীবনে কিছু পড়াশোনা হয়তো হয়েছে তার, অবশ্যই নিজের মতো করে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমের শৃঙ্খলার বাইরে, অল্পস্বল্প লেখালেখি, খানকয়েক কবিতা, দু-চারটে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সেটাও যে খুব নিয়মিত গুছিয়ে তা নয়, কোন জ্ঞানী পুরুষ যেন বলেছিলেন—দশপাতা পড়বে একপাতা লিখবে, কে বলেছিলেন? মনে করতে পারে না, তবে সে সেই দশপাতাকে হাজার পাতায় পরিণত করেছে।

সুজনডাঙাকে নিয়ে একটা বড়োসড়ো লেখা লিখবে ঠিক করেছে সে। গত কয়েকমাস ধরেই একটু একটু করে মনের ভেতর লেখাটা ডানা ঝাপটাচ্ছে, লেখাটা লিখে ফেলবেই এমন একটা পণ ক্রমশই দৃঢ় হয়ে উঠছে তার মনে। দু-চার পাতা লিখেছে, কেটেছে, আবার লিখেছে, আবার কেটেছে। তার জীবনের সঙ্গে লেখারও কী আশ্চর্য মিল! কেবল কাটাকুটি! দ্বন্দ্ব সংশয় প্রশ্ন অবিশ্বাস!

সুজনডাঙাকে নিয়ে কী লিখতে বসেছে সে? বাহান্ন বছর বয়েসী এই জনপদের ইতিহাস? লিখতে পারলে মন্দ হত না, কিন্তু না, নির্ঝর অন্তত এ বয়েসে এসে নিজেকে অনেকটা চিনতে পেরেছে, ও ইতিহাস-টিতিহাস লেখার মতো গবেষক সুলভ ধৈর্য নিষ্ঠা পরিশ্রমের ক্ষমতা কোনটাই নেই তার। তবে লেখাটার মধ্যে ইতিহাস যে একেবারে

থাকবে না তা নয়, জনপদের জন্মবৃত্তান্ত, উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কিছু স্মৃতিকথা, কিছু মানুষ—ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলা যায়। লেখাটা শেষ পর্যন্ত কী গতি লাভ করে কে জানে কিন্তু এই সূত্রে তার এক বড় প্রাপ্তি দাদুমণির দিনলিপির খাতা ও কিছু প্রকাশিত অপ্রকাশিত লেখা। জেঠু কমলেশের কাছেই সযত্নে রাখা ছিল, জানত নির্ঝর, কিন্তু আগে কোনো দিনই সেগুলো পড়ে দেখার ইচ্ছে হয়নি। দাদুমণির দিনলিপি পড়তে পড়তেই তার এই লেখাটি লিখবার আরও দুর্বার ইচ্ছা ক্রমশ সতেজ হয়ে উঠেছে, না হলে হয়তো অনেক পরিকল্পনার মতো, অনেক ভাবনার মতো এটাও নিতান্ত কয়েক দিনের খেয়াল হয়ে উঠতে পারত।

শুরু হতে না হতেই ধরে এসেছে বৃষ্টি, নিভে যাওয়া বিড়িটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে আলো নিভিয়ে জানলার ধারে সরে আসে। কী নিঝুম শান্তির ভেতর ডুবে আছে সুজনডাঙা! সামনের বাগানের গাছপালা এক ঝলক বৃষ্টির পর কী নিরুপদ্রব ঘুমের ভেতর দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে আছে। পাশের ঘরে মায়ের ঘন ঘন কাশির আওয়াজ, খুব গভীর ঘুম হয় না মায়েরও, আলো জ্বালা থাকলে একটু পরেই হয়তো উঠে এসে বলত, আজও রাত জাগছিস!

আচ্ছা, সুজনডাঙা বাজারের মোড়ে বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায় শরৎবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন, এভাবেই লেখাটা শুরু করতে চাইছি কেন আমি? ঘুমের মধ্যে যা দেখেছি, তা তো ঘুমের বাস্তব, জেগে থাকা সময়ের নয়, সুজনডাঙার জন্মবৃত্তান্ত দিয়ে, উপনিবেশ গড়ে ওঠার প্রথম দিকটা থেকেই লেখাটা শুরু করব এরকমই তো ভেবেছিলাম, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এলোমেলো করে দিতে ইচ্ছে হল কেন? কে জানে কেন? চেতনার আলোছায়া বৃষ্টি-অবৃষ্টির কতটুকুই বা বুঝি, না কি এ এক যুক্তিসঙ্গত অযুক্তির বিন্যাস?

শরৎবাবু! দাদুমণি এভাবেই লিখেছেন। প্রথম দিন পড়ে আমি ভেবেছিলাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বেশির ভাগ বাঙালির মতো আমিও শরৎবাবু বলতে ওই মানুষটিকেই তো বুঝি, শরৎ বসুকে কে আর মনে রেখেছে? তিনি যেন ইতিহাসের বাইরে চলে গেছেন। দাদুমণির প্রবন্ধে-নিবন্ধে দিনলিপির পাতায় অনেকবার এসেছে শরৎ বসুর কথা, অখণ্ড ভারত অখণ্ড বাংলার স্বপ্নভঙ্গের কথা।

আধুনিক বাংলা ও বাঙালির জীবনে সবচেয়ে ভয়ংকর দুর্বিপাক কি দেশভাগ? তা কি রুখে দেওয়ার পথে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যেত শরৎবাবুর প্রস্তাব মেনে কংগ্রেস-কে পি পি কোয়ালিশন হলে? দেশভাগের রাজনীতি যেন এক চাপা পড়া ইতিহাস হয়েই থেকে গেল, আমার বয়েসের যারা বাংলাদেশ, আসাম ত্রিপুরা আর এ বাংলায় জন্মানো বাঙালি, তারা বোধহয় সেভাবে কেউ কিছু জানেই না সে সব কথা। দেশভাগ বলতেই শুধু ধেয়ে আসে দাঙ্গা আর বিদ্বেষের স্রোত!

নির্ঝর দেখতে পায় তার দাদুমণিকে। নয়-দশ বছর বয়েস পর্যন্ত যতটুকু পেয়েছে

সে, ধুলোবালি মাখা ঝুলকালি জংধরা স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে ধীরে সুস্থে সেই ছোটোখাটো মানুষটি তার পাশে এসে দাঁড়ান। রোগা ঢেউখেলানো পাতলা সাদা কয়েকগাছি চুল, মোটা কালো ফ্রেমের চশমা।

খুলনা স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে ফেরিঘাট থেকে নৌকা করে রূপসা নদী পেরিয়ে মিটার গেজের লাইন, প্রথম রূপসা স্টেশন, দ্বিতীয় কর্ণপুর। কর্ণপুরে নেমে মাইলখানেক এগিয়েই নৈহাটি গ্রাম, আমাদের সাতপুরুষের গ্রাম। পাশের গ্রাম শ্রীরামপুর। দুই গ্রাম মিলিয়ে নৈহাটি-শ্রীরামপুর পোস্ট অফিস। নির্ঝর তার দাদুমণি অমলেশের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। দাদুমণির লেখায় ওই খুলনা শহর, রূপসা নদী, নৈহাটি গ্রাম ঘিরে কত হাহাকার, এসব ছেড়ে চলে আসার কী তীব্র যন্ত্রণা! সাতচল্লিশে আসেননি, ভেবেছিলেন থেকে যেতে পারবেন, তারপর পঞ্চাশে বাগেরহাট কালশিরা গ্রামের ভয়াবহ ঘটনার পর চলে এলেন। জেঠুর কাছে শুনেছে নির্ঝর, একাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পর দাদুমণি যেতে চেয়েছিলেন তাঁর জন্মস্থানে, কিন্তু ঘোর অসুস্থ তখন, বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারিতেই চোখ বুজলেন।

আচ্ছা, আমায় যদি কেউ বলে, তুমি চলে যাও সুজনডাঙা ছেড়ে, এ তোমার দেশ না, আর কোনোদিন এখানে আসবে না তুমি, কেমন লাগবে আমার? যদি সত্যিই এই সুজনডাঙা বিদেশ হয়ে যায়? ভেবে ঠিক যেন বোধের মধ্যে আসে না নির্ঝরের। এই সুজনডাঙা মাঝে মাঝে আমার কাছে অসহ্য লাগে, অথচ অনেক দিন ছেড়ে গিয়ে অন্য কোথাও থাকলে, ফিরে এসে মনটা কী খুশিতে ভরে ওঠে! জন্মভূমি বাল্য কৈশোর যৌবনের বা আরও বেশি সময়ের জীবনযাপনের ভূমি ছেড়ে চিরদিনের জন্য উৎখাত হয়ে গেলে কেমন লাগে—এ বোধহয় ঠিক কল্পনায় অনুভব করা যায় না। বাংলা গল্প উপন্যাস, নাটকে সিনেমায় সেভাবে যেন আসেনি দেশভাগ, বাঙালি জীবনের এত বড়ো এত ভয়ংকর ট্রাজেডির কথা সেভাবে উঠে এল না কেন, কে জানে! ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে অবশ্য বারবার এসেছে। নির্ঝরের মনে পড়ল ঋত্বিক তাঁর এক সাক্ষাৎকারে নিজেই বলেছেন যে, তিনি সত্যজিৎ রায় ও আরও কয়েকজন স্বাধীন বাংলাদেশে গিয়েছিলেন স্টেট গেস্ট হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি, সম্ভবত তিয়াত্তর সালে। প্লেনে করে যাচ্ছিলেন, পাশে সত্যজিৎবাবু বসে, যখন পদ্মা পেরোচ্ছেন তখন ঋত্বিক হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

ফেলে আসা দেশ নিয়ে জেঠু, বাবা সকলকেই স্মৃতিমেদুর হতে দেখেছি। কিন্তু আমি কোনোদিনই গভীরভাবে ভাবিনি দেশভাগ নিয়ে। আমি কেন, আমার প্রজন্মের কেউ কি ভেবেছে? ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয় হয়তো, জন্ম থেকেই পূর্বপারের ওই ভূখণ্ড বিদেশ আমাদের কাছে। একসময় বছর দশ-পনেরো আগে পর্যন্ত, বয়স্করা অনেকেই পরিচয় হওয়ার পরে পরস্পরকে বা অল্পবয়স্কদেরও জিজ্ঞেস করতেন, দেশ কোথায়

ছিল? অল্পবয়স্কদের যাদের জন্ম স্বাধীন ভারতের পশ্চিম বাংলায়, উত্তর দিতে গিয়ে তারা জানত আসলে তাদের বাপ-ঠাকুদ্দার জন্মস্থানের কথা, মূলত জেলার কথা জানতে চাওয়া হচ্ছে। এখন যেন সেই দেশ কোথায় জিজ্ঞেস করার লোকও খুব কমে গেছে, এ প্রসঙ্গ অবশ্য এখনও ওঠে বিয়ের সম্বন্ধে, পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনে। সে যা হোক, কিন্তু বাপ ঠাকুদ্দার দেশ, তাঁদের ওই জন্মভূমি বাসভূমির কথা ভুলে থাকা, অজ্ঞ, উৎসাহহীন, ভারতের কোটি কোটি বাঙালি যুবকের মতো আমিও আমার জাতির ইতিহাস-বিস্মৃতির উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলেছি।

চুলের ভেতর ডান হাতের আঙুল ধীরে ধীরে চালিয়ে নিতে নিতে নির্ঝরের মনে পড়ে, চিরকাল জেঠু কতগুলো শব্দ ঘুরেফিরে বারবার বলে, শিকড়, পরম্পরা, ঐতিহ্য, শব্দগুলোকে কোনোদিনই খুব আমল দেয়নি সে। বরং শুনলেই একসময় মাথার ভেতর রক্ত চড়ে যেত তার, গলা চড়িয়ে বলত, ঐতিহ্য? কীসের? সতীদাহের? শূদ্রকে পায়ের তলায় রাখার? নাকি জমিদারবাড়ির বাঈজী নাচের? জেঠু হেসে বলত, শুধু ওইসবই বাংলা নয়, ভারতও নয়। অথচ এখন সুজনডাঙাকে নিয়ে লিখতে শুরু করে—শিকড় সন্ধানের তীব্র আকুতি জেগে উঠছে তার, দাদুমণির দিনলিপির খাতা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে খুলনার ওই নৈহাটি গ্রামটিকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মশা ঘিরে ধরেছে। পায়ের পাতা, হাত, জ্বলছে সব। তত ঠাণ্ডাভাবও লাগছে না। লো স্পিডে ফ্যান চালিয়ে দেওয়া ভালো। ভেবে নির্ঝর ফ্যান অন করে রেগুলেটর ঘুরিয়ে দেয়। বারান্দায় আলো জ্বেলে বাথরুমে যেতে যেতে শুনতে পায় মল্লিকা বলছে, আজও এত রাত করছিস তুই! বাথরুমে ঢুকতেই মোটা বড়ো টিকটিকিটা সরসর করে দেওয়াল বেয়ে ছাদে চলে যায়। কী গতর! দেখলে ভয় করে, মনে হয় কামড়ে দেবে না তো! অবশ্য কেউ কোনোদিন টিকটিকির কামড় খেয়েছে বলে শোনেনি নির্ঝর।

মাথা ভার লাগে। ঘাড়েও ব্যথা। আজকাল প্রায়ই পায়ে হাতে ঘাড়ে ব্যথা হয়, মাস্‌ল পেইন। মাসকয়েক আগে ডাক্তারের কাছে যেতেই লিপিড প্রোফাইল, ইউরিক অ্যাসিড—আরও একগাদা টেস্ট লিখে দিল। একটা টেস্টও করা হয়নি। মা অবশ্য এই নিয়ে অনেকদিন বলেছে, কিন্তু করায়নি সে। চোখে মুখে ঘাড়ে একটু জলের ঝাপটা দেয়। ঘরে এসে গামছা দিয়ে মুছে ছোট আয়না হাতে নিয়ে চুল আঁচড়ায়। চিরুনি বড় নোংরা হয়ে আছে। কাল পরিষ্কার করবে ভেবে নিয়ে আলো অফ করে বিছানায় ঢুকে যায়।

বাপ-ঠাকুদ্দার দেশ, জন্মভূমির কথা ভাবতে গিয়ে, নিজের শিকড় খুঁজতে গিয়ে দেশভাগের কালো ইতিহাস, বেদনার ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামানো কি ঠিক হচ্ছে? এখন তো বিশ্বায়নের যুগ! সারা পৃথিবীই নাকি এক দেশ! নাকি একটি দেশই শাসন করবে সারা পৃথিবী! সে যা হোক, কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, যাঁরা উৎখাত হয়েছিলেন দুপারে তাঁদের চৌদ্দআনা হয় চিতায় নয় কবরে চলে গেছে অথবা যাওয়ার জন্যে পা

বাড়িয়ে আছেন। তাই কি? এখনও কি আসছে না শরণার্থী? নাকি অনুপ্রবেশকারী? তবু, দেশভাগের ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে? হিন্দু-মুসলমান কি দূরে সরে যাবে আরও? কিন্তু ইতিহাসের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে পরস্পরের আরও কাছেও তো সরে আসা যায়। না কি? শুধু দাঙ্গাই কি সত্যি? শুধু বিদ্বেষই কি সত্যি?

পাশ ফিরতে ফিরতে নির্ঝরের মাথায় ঘুরতে থাকে কত প্রশ্ন—তেভাগার পথ, হিন্দু-মুসলমান কৃষকের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের যে পথ শুরু হয়েছিল অবিভক্ত বাংলায়, সে পথ তখন রুদ্ধ হয়ে গেল কীভাবে? কীভাবে মাথা তুলতে পারল দাঙ্গা-বিদ্বেষ? সে কি তখনকার বাংলার রাজনীতি অর্থনীতি সমাজজীবনের সর্বত্র তেভাগা সফল হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন শ্রেণীর আধিপত্যের জন্যে? সে আধিপত্য কি ছড়িয়ে গিয়েছিল তেভাগার নেতাদের মধ্যেও? জেঠু যেমন বলে, সব ব্যাপারে কেবল ব্রিটিশের চক্রান্ত দেখব? নিজেদের দুর্বলতা বুঝতে চাইব না?

কে যেন ফিসফিস করে বলে যায় অনেক কথা সে কি দাদুমণি? নাকি জেঠু? কোলবালিশ আঁকড়ে ধরে নির্ঝর।

ব্রিটিশের একের পর এক গোলটেবিলের প্যাঁচ, নানারকম শয়তানির ফন্দি আঁটা, কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডের প্যাঁচ, সে প্যাঁচের সামনে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা কেমন জবুথবু, কিন্তু শরৎবাবু লড়ে গেলেন, তখন তিনি বাংলার কংগ্রেসের সভাপতি, প্রস্তাব নিল বাংলার কংগ্রেস ওই কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে তারপর...কত বড় ভুল হয়ে গেল, ৩৭ সালে ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন না করা, শরৎবাবুর কথা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা কানে তুললেন না কিছুতেই...হক সাহেব দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থক ছিলেন না তবু...

বুকের ভেতর দমচাপা ভাব, চিত হয়ে শোয় নির্ঝর, অস্থির লাগে।

আচ্ছা, এই সব কোয়ালিশন, মন্ত্রিসভা গঠন, নানা প্যাঁচ চাল, এসব নিতান্ত সারফেসের ব্যাপার, আসল ব্যাপার দুই ধর্মাবলম্বী মানুষের জীবনযাপন, তাদের সম্পর্কের দূরত্ব, মুসলমানির ছোঁয়ায় অপবিত্র হয়ে যাওয়ার ব্রাহ্মণ্যবাদী অনাচার আর জমিদারিতে ব্যাপক হিন্দু প্রাধান্যের উল্টোদিকে শোষিত অত্যাচারিত বিপুল মুসলমান কৃষক...

হঠাৎ থমকে যাওয়া ঝড়-বৃষ্টি বিপুল বেগে শুরু হয় আবার। দামাল কালবৈশাখী। ফের বিছানা থেকে উঠে জানালাগুলো বন্ধ করতে করতে বিড়বিড় করে নির্ঝর—ধর্ম এসে ভারত ভাঙল, বাংলা ভাঙল, তবু জেঠু এখনও যে কী করে এত ধার্মিক থাকে! ভেবে কূলকিনারা পায় না নির্ঝর।

আলো চলে যায়। প্রবল ঝড় বাইরে।

## দুই

চাঁদ কত দূরে বস্‌?

তিরানব্বুই ডি বাসের হেল্পার ভোলা রাতের আড্ডায় প্রায়ই এরকম প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। উত্তর পাওয়া না পাওয়ায় অবশ্য কিছু এসে যায় না ওর, অন্য প্রশ্নে চলে যায় বা নিজেই উত্তর দিয়ে দেয়। কখনও বা এক প্রশ্ন থেকে অন্য প্রশ্নের মধ্যবর্তী নীরবতায় গড়িয়ে যায় অনেক সময়।

এদিন অবশ্য নির্ঝর ভোলার প্রশ্নের উত্তরে আলতোভাবে ভাসিয়ে দিয়েছিল আরেক প্রশ্ন, কেন? যাবি নাকি চাঁদে?

ভোলা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে কোমর বেঁকিয়ে চোখের ওপর হাত রেখে মনোযোগ দিয়ে চাঁদ দেখছিল, যেন দূরত্ব পরিমাপ করছে, যেন এখুনি লাফ দিয়ে চলে যাবে চাঁদে! রোগা পাতলা জ্যোৎস্নায় বড় মাথায় একবোঝা এলোমেলো চুলের পাঁচ ফুট এক ইঞ্চির লিকলিকে শরীরের ভোলাকে এক অদ্ভুত প্রাণীর মতো দেখাচ্ছিল।

রাত এগারোটায় বাজারের মোড়ে বাসগুমটির পাশে মাসির চায়ের দোকানের বাইরে রাখা বেঞ্চিতে বসে নির্ঝর, উল্টোদিকে বাস-সিন্ডিকেটের বারোয়ারি বেঞ্চির এককোনায় ভোলা। সবে ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে চায়ের দোকানে, দু-একটা বাদে সব দোকানই বন্ধ, শুনশান মোড়। মাঝে মাঝে দ্রুতপায়ে হেঁটে যাওয়া পথচারী, সাইকেল মোটর-সাইকেল বেরিয়ে যায় দ্রুত। চায়ের দোকানের একটু দূরে রেললাইনের ধারে চালাঘরে তাসের জুয়ার আসর থেকে মাঝে মাঝে হল্লা ভেসে আসছে।

অনেক সময় ধরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা পেছন ঘুরে জড়ানো গলায় ভোলা বলে, ধর যদি এখান থেকে সোজা উড়ে যাওয়া যায় কতক্ষণ লাগবে চাঁদে যেতে?

প্রশ্নের মধ্যে কেমন এক অধীর আগ্রহ ছিল, যেন এ প্রশ্নের ঠিকঠিক উত্তর এই মুহূর্তেই জেনে নেওয়া ভারি জরুরি, যেন এর ওপর নির্ভর করে আছে ভোলার মরণ-বাঁচন! আন্দাজে যা হোক একটা উত্তর দিয়ে দিতে পারে নির্ঝর, কারণ তা-ই ভোলার কাছে বেদবাক্য, এ তো আর ক্যুইজের আসর নয় বা ভোলা তার বিদ্যের দৌড় পরীক্ষা করতে নেমেছে এমনও নয়, কিন্তু তা করে না নির্ঝর। সঠিক উত্তরের জন্য স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান বইয়ের স্মৃতি হাতড়ে মনে করার চেষ্টা চালায়, মনে পড়ে না। ভোলাকে নিরাশ করে বলে, ঠিক মনে পড়ছে না রে!

উল্টোদিকে বেশ খানিকটা তফাত রেখেই দাঁড়িয়ে ছিল ভোলা, ওর মুখ থেকে ভকভক করে ছুটে আসা চুল্লু আর জর্দা পানের কড়াপাক গন্ধ অসহ্য মনে হওয়াই সে-ই ভোলাকে দূরে গিয়ে বসতে বলেছিল। গত এক বছর মদ প্রায় ছেড়ে দিয়েছে সে,

তারপর থেকে অ্যালকোহল বিশেযত চুল্লু বা দেশি বা সস্তা ইংলিশ মদের ঝাঁঝ সহ্য হয় না, এর সঙ্গে জর্দার গন্ধ মিশলে তো আর রক্ষা নেই!

মিনিট দুই-তিন চুপ করে থাকার পর ভোলা তার স্বাভাবিক ঢঙেই গলার স্বর উঁচু-নিচু করে অনর্গল বকে যায়, বিষয় মোটামুটি চাঁদ, সূর্য, আকাশ ইত্যাদি। সে সব শুনেও যেন শুনছিল না নির্ঝর, চাঁদ বিষয়ক প্রশ্নের রেশ ধরেই সে যেন এক ঘোরের ভেতর ভেসে বেড়াচ্ছিল। এক নক্ষত্রের থেকে আরেকটি নক্ষত্রের দূরত্ব বেশি নাকি এক মানুষ থেকে আরেক মানুষ, মানুষের তুলনায় লাল পিঁপড়ে কত ক্ষুদ্র আবার পৃথিবীর তুলনায় মানুষ বা এই গ্যালকসির তুলনায় পৃথিবী—বাউণ্ডুলে নির্ঝর এ সব ভাবনার ভেতরেই ঘুরপাক খায়।

রাস্তার ধারে পরপর নিঝুম দাঁড়িয়ে থাকা দুটো বাসের মাঝ থেকে ঘেউঘেউ করতে করতে ছুটে যায় দু-তিনটে কুকুর। শেষ বাসটা চলে গেছে অনেকক্ষণ। সুজনডাঙার দুটো বাসরুটের একটা তিরানব্বুই ডি, বিটি রোড হয়ে শ্যামবাজার, ছোট রুট। গড়ে কুড়িটা বাস চলে, চার-পাঁচ ট্রিপ। ভোর ছ'টায় প্রথম বাস, শেষ বাস ছাড়ে রাত দশটায়।

ভোলা নির্ঝরের বহু বছরের চ্যালা। ভোলা যখন তাকে বস্ ডাকে, তখন ভোলাকে তার চ্যালা বলাই সঙ্গত বোধহয়। দুজনের বয়েসের ফারাক সাত-আট বছর। চ্যালা অবশ্য পেশা বা অন্য ব্যাপারে তার বসের মতো বাউণ্ডুলে নয়। ট্রেনে অল্প কিছুদিন হকারি করার পর এখন বাসের হেল্পার। অবশ্য হেল্পারি যে এই বাসরুটেই করছে এমন নয়, দমদমে কোনো এক মিনিবাস রুটে হেল্পারি দিয়েই তার বাসশিল্পে প্রবেশ। রেললাইনের ধারে বস্তিতে ঘর, রাতে মাঝে মাঝে বাসেও থাকে। হেল্পার থেকে অনেকেই ড্রাইভার হয়ে যায়, কিন্তু সে প্রায় দশ বছর ধরে হেল্পার। সে বলে ড্রাইভার হওয়া মানেই ঝামেলা, ভালো লাগে না, এই বেশ আছি।

এই বেশ আছি—বলতে বলতে প্রতিবার এক তৃপ্তির আভা ছড়িয়ে পড়ে তার মুখ চোখে। কতই বা রোজগার! বাসে দিনের মোট টিকিট বিক্রির ওপর চার পার্সেন্ট কমিশন আর খোরাকি বাবদ আরও কিছু, তাও সপ্তাহে রোজ ডিউটি পায় না। রেললাইন ধারের বস্তিতে আছে জন্ম থেকে, গৌরীর সঙ্গে একসঙ্গে আছে বছর ছয়-সাত। এক ছেলে এক মেয়ের বাপ। ছেলে তার নিজের, মেয়ে গৌরীর আগের পক্ষের। পাঁচ-ছয় বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে গৌরী। বেশ থাকার তৃপ্তির আভা মুখে নিয়ে ভোলা বলে, ভালোই চলে যাচ্ছে। ইচ্ছে হলে মদ-সিগারেট পাচ্ছি, ঘরে ডাঁশা মেয়েমানুষ, আহ্লাদে গা চাটতে খোকা, হুক করে নেওয়া হলেও ইলেকট্রিক পাচ্ছি, টিভিও আছে, আর কী চাই! বাপকে চোখে দেখিনি, ছোটোকালে দুবেলা পেট পুরত না—তা ভালো আছি না তো কী!

বছরখানেক আগে একদিন নির্ঝর খুব অবাক হয়েছিল যখন শুনেছিল ভোলা দেড় কাঠা জমি কিনেছে।

চোখ কপালে তুলে বলেছিল, বলিস কী র‍্যা? এই আয়ে জমি?: ভোলার লজ্জা মুখ, ঘাড় হেঁট, বলে, গৌরী না থাকলে হত না।

কোথায় কিনলি?

পশ্চিম পল্লি।

পশ্চিম পল্লি সুজনডাঙার একদম শেষ প্রান্তে, এর পরেই পুরসভা এলাকা শেষ, শুরু দেহাটা পঞ্চায়েত। পশ্চিম পল্লি আসলে বিল ছিল আগে, বর্ষায় এখনও কোমর সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। নিচু জমি. দাম কম. তবু জমি কেনা বলে কথা!

কাঠা কত করে?

দেড় কাঠা পনেরো নিয়েছিল, তবে এখন ও জমি পঁচিশ-তিরিশ হাজারের নীচে পাবে না।

তুই পাকা বিষয়ী হয়ে উঠেছিস—তোকে আর আমার চ্যালা রাখব কি না ভাবতে হবে।

সবই গৌরীর জন্যে। গৌরীর জমানো টাকায়।

ভারি অবাক লাগে নির্ঝরের। পাঁচ-ছয় বাড়ি কাজ করে কত হয়? ধর, হাজার টাকাই না হয় পায় গৌরী, ভোলার আয়ের একাংশ চলে যায় মদ-জুয়ায়। স্কুলে পড়ে দু-দুটো বাচ্চা। হোক ফ্রি প্রাইমারি। তবু খাতা বই পেনের একটা খরচ আছে তো। খাওয়া পরা-এটা-সেটা. তারপর আবার জমি। পারে কী করে!

নির্ঝর হেসে বলেছিল, এতদিন পরে খবর দিলি! তোর ফাইন এক প্যাকেট সিগারেট।

ঘন ঘন ট্রেনের হর্ন, সিগন্যাল পোস্টের সামনে থেমে আছে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে নির্ঝর, প্যাকেটের ভেতর সিগারেট নেই, গোটা চার-পাঁচ বিড়ি। ধূমপানেও ডাক্তার-নিষেধ রয়েছে, মদ্যপান ছাড়লেও তবু ধূমপান কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। দুদিন পরিমাণ কমালেও তৃতীয় দিনে সেটা আবার বেড়ে যায়, এভাবেই চলছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভোলা বলে, যতই তুমি না মানো, এই যে চাঁদ ওঠে, সূয্যো ওঠে, বছর ঘুরে ঠিক সময়ে শীত আসে, বিষ্টি আসে—কেউ না কেউ আছে এর পিছে। বাস যে চলে, কেউ তো চালায়, আমাদের পেছনে পিথিবির পেছনে ঠিক জেনো একটা ডাইভার...

জানিস্ ভোলা, আমাদের এই মহাবিশ্ব আদিতে একটা বিন্দুর মতো ছিল—তারপর এক বিগ ব্যাং—মানে একটা মহাবিস্ফোরণ হল, সে সব কোটি কোটি বছর আগে।

বি-স-ফো-র-ণ মানে বোমা ফাটল?

না, বোমা নয়, ওই বিন্দুটাই ফেটে গেল, ফেটে গিয়ে তৈরি হল এই মহাকাশ, পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, তারা, আলো...

তা'লেই বোঝ, এমনি এমনি কিছু ফাটে? কেউ না কেউ নিশ্চয় ফাটিয়েছিল!

কে জানে! মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে, কেন এই সৃষ্টি? কেন বাঁচা-মরা? ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাই না রে!

ওই তোমার রোগ! বড্ড বেশি ভাবো তুমি।

মাথার ভেতর ফাঁকা লাগে, কোনো কাজে তখন উৎসাহ পাই না।

ভোলা হঠাৎ নেচে নেচে গাইতে শুরু করে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গর নাম রে! হাতে তালি দিয়ে নাচের তালে তালে ক্রমশ গলার স্বর চড়তে থাকে তার।

হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল শিবু, রেললাইন ধারের বস্তিতেই থাকে, ঘরে ফিরছিল, ভোলাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, বলে, বেশ মজায় আছ ; দাঁড়ায় না, থমথমে মুখ নিয়েই চলে যায়।

ভোলা চিৎকার করে, অ্যাই শিবু, শুনে যা এদিকে।

দাঁড়ায় না শিবু, লেভেল ক্রসিং-এর ধার দিয়ে রেললাইনে উঠে যায়

ভোলা আবার আবার 'ভজ গৌরাঙ্গ' শুরু করতেই ধমক দেয় নির্ঝর, বলে, ওঠ বাড়ি যাব। ভোলা গান থামায় না তবে গলায় স্বর নামিয়ে নেয়।

নির্ঝর বলে, শিবুদের কী হল শেষ পর্যন্ত?

কী আর হবে? চেয়ারম্যান বলে দিয়েছে কোনো আবদার শুনবে না, কাউকে আর রাস্তার ধারে বসতে দেবে না।

বেচারা! এরা কী করবে এবার?

স্টেশনের পুবদিকের অরবিন্দ রোডের ধারে বিকেলে কাঁচা সবজি নিয়ে অনেক মানুষ ব্যবসা শুরু করেছিল, তা প্রায় বছর দশ হবে। প্রথম দিকে একজন-দুজন আলু, পেঁয়াজ, তরি-তরকারি নিয়ে বসত। স্টেশন থেকে নেমে অনেকে আর বাজারে না ঢুকে টুকটাক কিনে নিত এখান থেকেই, তারপর ক্রমশ এদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। চট বা পলিথিন বিছিয়ে সার সার অস্থায়ী দোকান। কেউ কেউ টিন টালি বাঁশ বেড়া দিয়ে স্থায়ী দোকানও বানিয়ে ফেলল। এরা প্রায় সকলেই রেললাইন পাড়ের ঝুপড়িতে থাকে। শিবু এদেরই একজন।

বাজার বেড়ে ব্যস্ত রাস্তা ক্রমেই ছোটো হয়ে এসেছে, বন্ধ হয়ে গেছে ড্রেনগুলো। এছাড়া রিক্সা, সাইকেল ভ্যান, অটোর পাশাপাশি পথচারি, দু-একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, সন্ধেয় ও রাস্তা দিয়ে যাতায়াত খুবই কষ্টসাধ্য। অনেকদিন ধরেই স্থানীয় মানুষের একাংশ দাবি করছিল, এ বাজার বন্ধ করতে হবে। পুরসভায় ডেপুটেশনও দেয়। গত পুরসভা ভোটে পরপর দু'বার জিতে আসা কাউন্সিলার তৃতীয়বারে এই ইস্যুতে কোনোক্রমে হারতে হারতে টিকে গেছে।

গতকাল সকালে পুরপ্রধান, থানার অফিসার, ওয়ার্ড কাউন্সিলার এদের উপস্থিতিতে

অবৈধ কাঠামোগুলো ভেঙে দেওয়া হয়। হোমগার্ড ও পুলিশ পোস্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয় এখানে কাউকে আর বসতে দেওয়া হবে না।

শুনেছি বিকেলে মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়েছিল, বস্তি কমিটির লোকজনরাও ছিল, বলতে বলতেই ভোলা বুড়ো আঙুল বাঁকিয়ে বোঝায় ফল কিছু হয়নি।

অন্য কোনো জায়গা কি দেবে ওদের?

না, সেরকম কিছু শুনিনি। দু-চার জনের বাজারের ভেতর জায়গা আছে, তারা হয়তো বসবে সেখানে।

নির্ঝর উঠে দাঁড়ায়, বলে, চ, এগিয়ে দিবি। ভোলা একটু এগিয়ে একটা লম্বা কাঠ তুলে হাতে নেয়, রাস্তায় কুকুরের উৎপাত ঠেকাতে।

কুকুর কিছু করবে না, চেনে আমাদের।

না, দুজনে যখন যাই বলে না কিছু, একা একা ফেরার সময় হঠাৎ এক এক দিন—

এই লোকগুলোর কী হবে রে?

কী আর হবে? মায়ের ভোগে যাবে।

ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করে সব।

যখন বসেছিল তখন কি জানত না উঠে যেতে হবে, একি বাপের সম্পত্তি, রাস্তাঘাটে যেখানে খুশি—

ভোলা! গলা চড়িয়ে ধমক দেয় নির্ঝর।

কেন? ভুল বলেছি? গলা নামিয়ে বলে ভোলা।

পুরো দেশটাকে কত লোক সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছে জানিস, লুটেপুটে খেয়ে নিচ্ছে, কই তাদের তো কেউ—

দুজনে চুপচাপ হাঁটতে থাকে পাশাপাশি। রেল বস্তির অধিকাংশ মানুষই ওপার বাংলার। নির্ঝর ভাবে, একদিন আমাদের বাপ-ঠাকুদ্দাও চলে এসেছিল, তখন এ বাংলার পুরনো বাসিন্দারা অনেকেই ভালোভাবে নেয়নি তাদের, অনেক বাধা ঘেন্না বিপত্তি, আজ দু-এক পুরুষ পরে, সেইসব উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেরাও এই সব গরিব নতুন উদ্বাস্তুদের বিরক্তি ঘেন্নার চোখে দেখে। জেঠু বলে, এরা যে সকলেই ভিটেমাটি হারিয়ে চলে আসছে তা নয়। ঠিক উদ্বাস্তু বলা যায় না, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে চলে আসছে অভাবের তাড়নায়। ভারতবর্ষ, এত বড়ো দেশ, অর্থনীতি তুলনায় সবল, কিছু একটা রুজি-রোজগার হয়ে যাবে এই ভেবেই ঢুকে পড়ছে সীমান্ত পেরিয়ে, শয়ে শয়ে।

বাস্তবিক, প্রতিবেশী দেশ থেকে এভাবে চলে আসা লক্ষ লক্ষ লোকের স্রোত কোন্ দেশই বা মেনে নিতে পারে, দেশ বা রাজ্যের অর্থনীতি, পরিকল্পনা সবই এলোমেলো হয়ে যায় ভিড়ের চাপে, নাকি? কিন্তু ঠেকাবে কী করে? এক ভাষা, একরকম চেহারা, ঘর এক দেশে উঠোন আরেক দেশে, কাঁটাতারের বেড়ায় ঠেকানো যায় কি? তা ছাড়া

মানবিকতা? সে কথা ভাবলে এই গরিব অসহায় মানুষগুলোর প্রতি কীভাবে নির্মম হওয়া যায়! দেশভাগ—সমস্যার একটু গভীরে ঢুকলেই ঘুরে ফিরে সেই দেশভাগের কথাই এসে যায়। আপনমনে মাথা নাড়ায় নির্ঝর। ভোলা বলে, একটা বিড়ি দাও বস্।

বিড়ি দিতে দিতে নির্ঝর বলে, এদের অন্য কোথাও জায়গা-টায়গা দেখে একটা ব্যবস্থা—

বস্তি কমিটির দীপুদা সেরকম বলছিল, সে দাবিতে মিউনিসিপ্যালিটি ঘেরাও করবে বলছিল, বলছিল রেল আটকাবে।

সম্প্রতি বছর দুই রেলপারের মানুষজনকে নিয়ে একটা এন জি ও তৈরি হয়েছে। বড়োসড়ো ইংরাজি নাম আছে একটা, তবে লোকের মুখে মুখে সেটা বস্তি কমিটি। এদের মাথা দীপু বিশ্বাস, নির্ঝরের থেকে বয়েসে বেশ খানিকটা বড়োই হবে। একসময় সক্রিয় রাজনীতি করত, এখন এই এন জি ও নিয়েই আছে। লোকে তার কাজ নিয়ে নানা বাঁকা কথা বললেও, নির্ঝর অবশ্য ভালো মনে করে। এই প্রথম এদের নিয়ে একটা সংগঠন হয়েছে। কিছু একটা চেষ্টা তো চালিয়ে যাচ্ছে লোকটা, ভালো কতটা করছে জানে না, অন্তত এদের মন্দ কিছু করেনি।

হাঁটতে হাঁটতে গলির মুখে ঢুকতেই ঘেউ ঘেউ করে দুটো কুকুর ছুটে এলেও কাছে এসে থেমে গেল। ভোলা ফিরবে এবার।

নির্ঝর বলে, ভালো লাগে না রে!

কী?

সুজনডাঙার বয়েস যত বাড়ছে, কেবল রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে, কেমন হৃদয়হীন, থলথলে মেদ-সর্বস্ব একটা গতর! সুজনডাঙা অভিজাত, মানে এলিট হয়ে যাচ্ছে রে!

কী যে বল আলফাল! বুঝতে পারি না।

কত ভাবনা কিলবিল করে মাথায়, রাতের পর রাত ঘুম আসে না।

জীবনটুকু তুমি শুধু-মুধু নষ্ট করলে বস্! ইচ্ছে করলে আজ তুমি—

তুই তখন ড্রাইভারের কথা বলছিলি, পেছনে এক ড্রাইভারের কথা ভেবে নিয়ে সব ভার তাকে সঁপে দিয়ে হয়তো বাঁচা অনেক সহজ হয়ে যায়। কিন্তু দেখিস—

কী?

চাঁদ, তারা, পৃথিবী এমনকি তোর ওই ড্রাইভার এসবের অস্তিত্ব তোর কাছে ততক্ষণই যতক্ষণ বেঁচে আছিস তুই, তাই না?

কী যে বল, বুঝতে পারি না। বাড়ি যাও দেখি এবার।

মানুষ কি ঈশ্বরের হাতে বা ব্যবস্থার হাতে নাচতে থাকা পুতুল? কী রে ভোলা, মানুষ কি যন্ত্র, কলকব্জা?

অল্প হাওয়া। পাতলা মেঘে ঢেকে যায় চাঁদ। আবার বেরিয়ে আসে।

রাত বাড়ে। চলতে থাকে কথা। কথার পিঠে আরও কথা। মেঘ জ্যোৎস্নার লুকোচুরিতে রহস্যময় হয়ে ওঠে সুজনডাঙার রাত।

## তিন

রবিবারের বিকেল। বাজারে দশকর্মার গলি ঝিমোচ্ছে। রোদ পড়েছে সবে। এ গলিতে পরপর সব কটাই দশকর্মার দোকান, শুধু একটা কবিরাজ ঘর। সেখানে আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা হোক না হোক, সকাল সন্ধে প্রবীণদের আড্ডা জমে। সেদিনও চার-পাঁচজন বসে। মধ্যমণি কমলেশ, নির্ঝরের জেঠু। রোজ কমলেশ বিকেলে কিছুটা সময় কাটিয়ে যান এখানে। আটাত্তর বছর বয়েসেও সুজনডাঙায় তাঁর অজস্র আড্ডা, এখানকার বহু সংগঠনের সঙ্গে জড়িত তিনি। সুজনডাঙায় সমবেত উদ্যোগে দু-তিনটে সংগঠন মিলে কিছু করলেই, সভাপতি একজনই, শ্রী কমলেশ বসু। সবচেয়ে পুরোনো তিনটি ক্লাবেরও তিনিই সভাপতি। বইমেলা কমিটি থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণ সমিতি কিংবা সুজনডাঙা কলোনি কো-অপারেটিভ সোসাইটি সর্বত্রই তিনি কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকেন—প্রধান উপদেষ্টা, সভাপতি, পরিচালক ইত্যাদি।

আড্ডায় রয়েছেন কাশীনাথ মিত্র, বয়েসে কমলেশের থেকে দু-এক বছরের কমই হবেন, তবে চেহারায় তাঁকেই অতিবৃদ্ধ দেখায়। রয়েছেন বিনোদ মজুমদার তুলনায় বয়েসে নবীন, সত্তর-একাত্তর হবে। কবিরাজ ঘরের দীনেন কবিরাজ আছেনই।

তবে নিয়মিত আড্ডাধারীদের মাঝে আজ অবশ্য এক অতিথি এসে পড়েছেন, অনাথবন্ধু ঘোষ। ইনিও নানা সামাজিক সংগঠনে কাজকর্মে যুক্ত। গবেষক প্রাবন্ধিক হিসেবে কিঞ্চিৎ নামডাক আছে। সুজনডাঙা কলোনি কো-অপারেটিভের একসময়ের একজন পরিচালকও ছিলেন, এঁদের গোষ্ঠীকে হারিয়েই কমলেশদের গোষ্ঠী কো-অপারেটিভের ক্ষমতা দখল করে।

সুজনডাঙার জন্মকথা নিয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই, এতই নবীন উদ্বাস্তু উপনিবেশ থেকে উপনগর হয়ে ওঠা খাস কলকাতার কয়েক কিলোমিটার দূরের এই জনপদ। এর জন্মকথাকে ইতিহাস বলতেও হয়তো বাধো বাধো ঠেকবে। ঠিক কতটা প্রাচীন হলে অতীত 'ইতিহাস'-এর পর্যায়ভুক্ত হয় তা হয়তো বলা মুশকিল, তবে সুজনডাঙার জন্ম উনিশ'শ পঞ্চাশের এপ্রিল মাসে। ওই মাসের তিন তারিখে বাংলাদেশের খুলনা জেলার কয়েকটি গ্রামের প্রায় দুশো পরিবারের কম-বেশি সুজনডাঙার শ্যামপুকুরের পূর্বপাড়ের আমবাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পনেরোই এপ্রিল নোদাখালির সীতানাথ সরকারের

বাড়িতে এক সভায় ওইসব উদ্বাস্তু পরিবারের উপস্থিতিতে তৈরি হয় সুজনডাঙা কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড।

জন্মকথা নিয়ে কোনো বিতর্ক না থাকলেও কো-অপারেটিভ সোসাইটির ভূমিকা পরিচালনা সহ সুজনডাঙার উন্নয়ন ও গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত নিয়ে বিতর্কের সীমা নেই, সে বিতর্ক আজও চলে প্রবীণদের মধ্যে।

রবিবারের বিকেলের আড্ডায় আজও সেই বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। পথের শর্টকাট করতে এই গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন অনাথবন্ধু। কমলেশ দেখতে পেয়ে ডাক দেন। দু-এক কথার পর অনাথবন্ধু জানালেন, ধীরেন বসুর জন্মশতবর্ষ আগামী বছর, তা পালনের জন্য ওঁরা একটা প্রস্তুতি কমিটি করেছেন, নানা কর্মসূচিও নিয়েছেন।

সুজনডাঙার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে ধীরেন বসুর নাম। কলোনি কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রথম চেয়ারম্যান। মারা গেছেন তাও প্রায় বছর পঁচিশ হল। জন্মশতবর্ষের নানা কর্মসূচি সম্পর্কে কমলেশকে জানাচ্ছিলেন অনাথবন্ধু। এ পর্যন্ত বিতর্কহীন শান্ত আলাপ-আলোচনা চলছিল। গোল বাধল গলিতে নির্ঝরের ঢুকে পড়ার পর।

এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতেই নির্ঝর ঢুকে পড়েছিল। কাল সারারাত শ্মশানে কেটেছে। এক বন্ধুর বাবা মারা গেছেন। সকাল থেকে পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে বারোটা নাগাদ উঠে স্নান করে খেয়ে আবার ঘুম, বিকেলে উঠে শরীর এত ম্যাজম্যাজ করছিল, হাঁটতে বেরিয়ে পড়েছিল। ঘণ্টাখানেক হেঁটে ফিরে এসে প্রুফ দেখতে বসবে ভেবে রেখেছিল। বেশ কয়েক মাস বেকার কাটানোর পর আবার প্রুফ দেখার কাজ শুরু করেছে। গত সপ্তাহেই কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গিয়ে একগাদা কাজ নিয়ে এসেছে। মঙ্গলবারের মধ্যেই জমা দিতে হবে, টেলিফোনে তাগাদাও পেয়েছে, সে কাজের অর্ধেকেরও বেশি বাকি পড়ে আছে। এদিকে সুজনডাঙাকে নিয়ে লেখাটাও কদিন ধরে খুব ঘুরছে মাথায়, বেশ কয়েক পাতা লেখাও এগিয়েছে।

নির্ঝরকে ডাক দিলেন কাশীনাথ। ওকে দেখিয়ে অনাথবন্ধুকে বললেন, একে চেনো?

তাকিয়ে থাকলেন অনাথবন্ধু, চিনতে পারছেন না। কাশীনাথ হেসে বললেন, আরে এ আমাদের কমলেশের ভাইপো। বলেই খকখক করে কাশতে শুরু করলেন। লম্বা, রোগা, মাথার পেছনে কয়েক গাছি সাদা চুল। লুঙ্গির ওপর একটা আধাময়লা হাওয়াই শার্ট।

অনাথবন্ধু নির্ঝরকে বললেন, তোমায় অনেকদিন পরে দেখলাম, চেহারা পাল্টে গেছে, চিনতে পারিনি, কিছু মনে কোরো না বাবা। একটু সরে গিয়ে হাত ধরে টেনে নির্ঝরকে বেঞ্চিতে বসালেন বিনোদ।

কাশীনাথ অনাথবন্ধুকে বললেন, এইসব ইয়ং ছেলেছোকরাকে তোমার কমিটিতে— বলতে বলতে আবার কাশি।

অনাথবন্ধু নির্ঝরের পেশা ইত্যাদি ব্যক্তিগত দু-একটি খোঁজখবর নিয়ে ধীরেন বসু জন্মশতবর্ষের কথা শুনিয়ে বললেন, জন্মস্থানকে ভুলো না বাবা, আর এই সুজনডাঙাকে মনে রাখতে গেলে তার প্রতিষ্ঠাতাকে ভুললে কি চলে!

ব্যাস, আগুনে পেট্রল। প্রথম রুখে উঠলেন বিনোদ, না অনাথদা না, সুজনডাঙা কারও একার চেষ্টায় গড়ে ওঠেনি, ইতিহাসের ধীরেনকরণ করবেন না অনাথদা।

শুরু হয়ে গেল তুমুল বিতর্ক। সকলেই অবশ্য বলতে চান নির্ঝরকে উদ্দেশ্য করে, সকলেরই টার্গেট শ্রোতা নির্ঝর।

বিনোদ বলেছিলেন, প্রথম যে দুশো পরিবার এসেছিল এখানে তার অধিকাংশ চাষী পরিবার, সারা দিন সারা রাত ধরে এরা হোগলা কেটে বাঁশঝাড় কেটে—আশেপাশের গ্রামের লোকজন, জমির মালিকের পোষা গুণ্ডা এদের সঙ্গে লড়াই করে—

কিন্তু কলোনি কো-অপারেটিভ কে তৈরি করলেন?

একা কেউ করেনি, ধীরেনব্যবু প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন এ কথা ঠিক কিন্তু একজনকে নিয়ে কি সমবায়—সমবায় দপ্তরের ডেপুটি রেজিস্টার মহেন্দ্রবাবু, যাঁর বাড়িতে প্রথম মিটিং হয়েছিল আমাদের কাশীনাথদার শ্বশুরমশাই সীতানাথ সরকার—

দেখ বিনোদ, এতবড়ো একটা কলোনি একা কেউ গড়তে পারে না এ সবাই বোঝে, কিন্তু যিনি নেতা, যাঁর নেতৃত্বে বাঁশঝাড় হোগলাবন থেকে গড়ে উঠল আজকের সুজনডাঙা—তাঁকে প্রতিষ্ঠাতার সম্মান দেওয়া কি অন্যায়?

আলবৎ অন্যায়। যেটা একা কোনো ব্যক্তির ব্যাপার নয়, সবাই মিলে একটা কাজ শুরু করল—

তা ছাড়া নেতাগিরিও কেমন ছিল সেটাও দেখতে হবে, হাসিমুখে একটু চিমটি কাটলেন দীনেশ কবিরাজ।

নির্ঝর বুঝতে পারছিল খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন অনাথবন্ধু। উত্তেজনা যথাসম্ভব চেপে তিনি অবশ্য হাসিমুখে নির্ঝরের দিকে ফিরে বলে যাচ্ছিলেন। প্রথম দুশো পরিবারের অনেককেই ধীরেনবাবু চিনতেন ব্যক্তিগতভাবে আগে থেকেই, ওঁরা যখন অসহায় অবস্থায় রেল প্লাটফর্মে রিফুইজি ক্যাম্পে কোনোক্রমে টিকে থাকার চেষ্টা করছিলেন তখন উনিই ওঁদের...

বিনোদ যেন একফুঁয়ে মোমবাতি নেভাচ্ছেন, বললেন, বাজে কথা, আপনি তিলকে তাল বানাচ্ছেন!

এ বিতর্ক অন্তহীন চলবে বুঝতে পারছিল নির্ঝর। সে ছোটোবেলা থেকেই শুনেছে ধীরেন বসুর নাম, দেখেছে একদল তাঁর গুণমুগ্ধ, কেউ কেউ অন্ধভক্ত আবার কেউ তাঁর কঠোর সমালোচক। দাদুমণির দিনলিপিতে যেটুকু চোখে পড়েছে অবশ্য ওঁর সম্পর্কে প্রশংসার কথাই লেখা আছে, কিন্তু জেঠুর বক্তব্য দাদুমণির প্রশংসার সঙ্গে মেলে না।

সে যা হোক, কিন্তু মানুষটিকে অস্বীকার করতে পারেন না কেউ। সুজনডাঙার জন্ম থেকে অন্তত প্রথম পঁচিশ বছরের ইতিহাসের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছেন ধীরেন চন্দ্র বসু।

নির্ঝরের মনে পড়ে, সে যখন ক্লাস এইটের ছাত্র, উনি মারা যান। দাদুমণির সঙ্গে ওঁর খুলনায় থাকার সময় থেকে পরিচয় ছিল। মাঝে মাঝে আসতেন ওঁদের সুজনডাঙার বাড়িতে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, বিশাল শরীর, খুব উচ্চ স্বরে কথা বলতেন, বহু দূর থেকে টের পাওয়া যেত যে তিনি আসছেন। দাদুমণি দিদার সঙ্গে দু-চারটি কথা সেরেই আবার বেরিয়ে পড়তে চাইতেন, কিন্তু দিদা তাঁকে মিছরির সরবত না খাইয়ে উঠতে দিতেন না। সে শুনেছে, জীবনের শেষ পনেরো-কুড়ি বছর কাজের চাপে তিনি সারাদিন কিছুই খেতেন না, রাতে একবারমাত্র ভাত খেতেন। তবে সে খাওয়ার পরিমাণ অবশ্য অনেকের দুবেলা খাওয়ার পরিমাণের চেয়েও বেশি। ভোরবেলা কাজে বেরুনোর আগে এক গ্লাস মিছরির সরবত। ব্যস, বাইরে জল ছাড়া আর কিছু নয়, তবে দিদার দেওয়া মিছরির সরবতে আপত্তি ছিল না। দাদুমণির সঙ্গে বন্ধুত্ব, অথচ জেঠু, বাবা এঁরা ওঁর ঘোর বিরোধী।

সেই পঞ্চাশের দশকেই সুজনডাঙা পত্তনের কয়েক বছরের মধ্যেই মূলত ধীরেন বসুর নেতৃত্বে কো-অপারেটিভ সোসাইটির নানা কাজকর্ম যা অনেকের কাছে অন্যায় স্বেচ্ছাচারী বলে মনে হয়েছিল তারই প্রতিবাদে গড়ে ওঠে সুজনডাঙা গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি। এদের আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন কমলেশ। জেঠু আর দাদুমণির মধ্যে ধীরেন বসুকে নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্কের কথা আবছা মনে পড়ে নির্ঝরের, যদিও সে সব ঠিকঠাক বুঝে ওঠার বয়েস হয়নি তখনও। দাদুমণির লেখাপত্র থেকে জেনেছে খুলনাতেও যুবক ধীরেন সামাজিক কাজকর্মে প্রথম সারিতেই ছিলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য, পরে সভাপতিও হয়েছিলেন। এদেশে এসে সুজনডাঙাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। অবশ্য জীবনের শেষ পর্বে সুজনডাঙার কর্তৃত্ব অনেকটাই তাঁর হাতের বাইরে চলে যায়। তবুও এ মাটিতে তিনি এক মিথ, এ অঞ্চলে তাঁকে নিয়ে ছড়িয়ে আছে কত ঘটনা গল্প—কতটা সত্যি মিথ্যে কে জানে!

কাশীনাথ বলছিলেন, যাই বল বাপু, মানুষটা গুণী ছিলেন। এখানে কত গুণী শিক্ষিত মানুষকে যে উনি ডেকে ডেকে নিয়ে এসেছেন! আমার বাবা দেশ ছেড়ে এসে প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন যাদবপুরে ছিলেন, কাজকর্ম ছিল না, খুব কষ্ট, ধীরেনবাবু কার কাছ থেকে খবর পেয়ে ডেকে নিয়ে এসে বয়েজ স্কুলে ঢুকিয়ে দিলেন, বললেন, আপনার মতো গুণী মানুষও কাজ পেলেন আর এখানকার ছেলেমেয়েদের সৌভাগ্য যে আপনার মতো শিক্ষক পেল। এরকম কতজনকে—ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল, ওপার বাংলা থেকে এসে থিতু হতে পারেননি খবর পেলেই উনি ডেকে এনে জমি দিয়ে—বলতে বলতে হাঁফ আসছিল কাশীনাথের।

এককোণে এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন শীতল মণ্ডল, গম্ভীর মুখখানা দেখলেই মনে হয় পৃথিবীর সব দুঃখ বিষণ্ণতা জমা হয়ে আছে। কথা বলেন খুব ধীর লয়ে, বললেন, কাশীদা একটা কথা—

বল।

উনি সুজনডাঙার জন্য অনেক কাজ করেছেন, পরিশ্রম করেছেন, তা মানতেই হবে। কিন্তু সেসব কি নিঃস্বার্থভাবে করেছিলেন?

নিঃস্বার্থভাবে কি না সে বলা—

একজন সাধারণ সরকারি চাকুরের এতবড়ো বাড়ি, সচ্ছলভাবে অতবড়ো সংসার প্রতিপালন—তাছাড়া রিফুইজি রিহ্যাবিলিটেশনের জন্যে সরকারি-বেসরকারি যত টাকা এসেছে সে সবের হিসেব-নিকেশ, কো-অপারেটিভের হিসেব-নিকেশ নিয়ে—

বিনোদ সোচ্চারে সমর্থন জানিয়ে বললেন, ঠিক কথা বলেছে শীতল, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করলে বা গুণী মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চললে সুজনডাঙার আরও উন্নতি হত. উনি সেইসব গুণী মানুষকেই মর্যাদা দিতেন যাঁরা ওর স্তাবকতা করতেন। সামান্য বিরোধিতাও সহ্য করতে পারতেন না।

অনাথবন্ধু ক্ষোভে মানা নাড়াচ্ছিলেন, আরও উন্নতি। সারা পশ্চিমবাংলায় আর একটা নজির দেখাতে পারবে যে বেসরকারি উদ্যোগে স্থানীয় জমির মালিকদের কাছ থেকে জমি কিনে প্লট বিলি করে একটা জলাজমি বাঁশঝাড় হোগলাবন থেকে এতগুলো স্কুল, দুটো কলেজ, হাসপাতাল, পোস্ট-অফিস, বাজার, কলোনি পত্তনের পনেরো বছরের মাথায় মিউনিসিপ্যালিটি, জলের ট্যাঙ্ক—আচ্ছা, তোমরা কি ভুলে গেছ—আমাদের সুজনডাঙা কো-অপারেটিভ সোসাইটি সারা বাংলায় সবসেরা হয়ে ৬১ সালে বি সি রায় শিল্ড পেয়েছিল!

নির্ঝরের হাত ধরে আবেগঘন গলায় অনাথবন্ধু বললেন, ইতিহাসকে এরা বিকৃত করছে বাবা!

বিনোদ, শীতল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনি বিকৃত করছেন ইতিহাস, বহু মানুষের পরিশ্রম চেষ্টাকে একজন ব্যক্তির নামে চাপিয়ে দিতে চাইছেন, কারণ এর প্রসাদ আপনারাও পেয়েছেন—আপনারাই ওর মৃত্যুর পরও পনেরো বছর ধরে কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন সোসাইটি, জমি বেচে কম টাকা করেছেন? সোসাইটির নতুন কমিটি হওয়ার পর, এই কমলেশদারা ক্ষমতায় আসার পর মানুষ জমির দলিল পেয়েছেন, পাওয়া গেল পঁয়তাল্লিশ বছর পরে—এতদিন কী করছিলেন আপনারা? জবাব দেবেন না?

আসলে এর কতটা বিনোদ বলছিলেন আর কতটা শীতল, তা বোঝার উপায় ছিল না—অনাথবন্ধু, কাশীনাথ এঁরাও কিছু বলছিলেন উচ্চস্বরে। গোড়া থেকেই একটি কথাও না বলে চুপ করে আছেন কমলেশ।

নির্ঝর ইতিহাস শব্দটির গুরুত্ব অনুভব করতে পারছিল। আর তা তাকে এক ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছিল। এই প্রবীণ মানুষেরা প্রত্যেকেই তাঁদের সামনে বসে থাকা নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধিকে প্রভাবিত করতে চান। এঁদের দু'পক্ষই দাবি করছেন এঁদের বক্তব্যই একমাত্র সঠিক, খাঁটি সত্য!

অথচ বস্তুনিষ্ঠ সত্য ইতিহাস বলে কি আদৌ কিছু হয়? নানা মানুষের নানা দৃষ্টি-ভঙ্গি, নানা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য, সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর তার অনেকাংশেরই কোনো রেকর্ডও থাকে না। মাত্র পঞ্চাশ বছর ব্যবধানেই এত পরস্পর বিরোধী বক্তব্য, আজ থেকে দেড়শো-দুশো বছর পর কেউ যদি সুজনডাঙার পত্তনপর্ব নিয়ে জানতে চান, কী জানবেন তিনি? লিখিত রেকর্ড খুব কম, যেটুকু পাওয়া যাবে সেখানেও নানা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য—নাগরিক সমিতির পত্রিকা ঘাঁটলে একরকম আবার সোসাইটির মুখপত্র ঘাঁটলে আরেক রকম, এখানকার নানা পত্রপত্রিকায় খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচারণায় বক্তব্যের নানা অমিল—তা থেকে সত্য উদ্ধার করা কি সম্ভব হবে? ক'জন মানুষ তাঁদের সাফল্য ব্যর্থতার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন? ক'জন তাঁদের ব্যর্থতা স্বীকার করতে পারেন? নির্দ্বিধায় উত্তরকালের কাছে রেখে যেতে পারেন তাঁদের আত্মসমালোচনার পঞ্জি? ক'জন তাঁদের কর্মকাণ্ডের সাফল্যকে বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন? নিরপেক্ষতা বলে কি কিছু হয়? নিরপেক্ষ ইতিহাস বলে কি কিছু হয়? সত্য নয় মিথ্যা নয়, হ্যাঁ বা না নয়, বোধহয় থেকে যায় এক ধূসর এলাকা।

কমলেশের ধমকে চমকে উঠে ভাবনায় ছেদ পড়ে নির্ঝরের। নির্ঝরকে ধমক দেননি তিনি, তর্ক-বিতর্ক যা এখন এক বিশ্রী ঝগড়ায় পরিণত হয়ে গেছে, তা থামাতেই তিনি এক চিৎকার দিয়ে ওঠেন। বলেন, চুপ করুন সবাই, কী হবে এসব ঝগড়া করে?

অনাথবন্ধু বললেন, সত্য সূর্যের মতো, সত্যের জয় হবেই, সত্যকে চিরকালের মতো ঢেকে ফেলা যাবে না!

কমলেশ বললেন, আপনার সত্য আপনার কাছে, তা তো কেউ ঢেকে ফেলতে পারেনি, অন্যের সত্য অন্যের মতোই না হয় থাকতে দিন!

শীতল, বিনোদ এঁরা আবার কিছু বলতে চাইছিলেন, কমলেশ বললেন, না, আর কোনো কথা নয়।

সবাই চুপ। তাল কেটে গেল, অনাথবন্ধু বেরিয়ে পড়লেন। কমলেশও উঠে পড়লেন, পিছু পিছু নির্ঝর।

বাজারের ভেতর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নির্ঝর বলল, কোথায় যাবেন এখন?

সবুজ সংঘে, ওদের জয়ন্তী উৎসবের মিটিং আছে।

চুপচাপ হেঁটে চলে দুজনে। নির্ঝরের মাথায় ঘুরছিল সুজনডাঙা নিয়ে তাঁর লেখাটার

কথা, এই তর্ক-বিতর্ক তার ভাবনাকে উসকে দিল, নতুন কিছু ভাবনা বিন্দু তৈরি হল।

জেঠু?

বল।

একদম প্রথমে সুজনডাঙায় যাঁরা এসেছিলেন, সেই দুশো পরিবারের কেউ আছেন বেঁচে?

হ্যাঁ, অনেকেই আছেন, যেমন তারাপদ বিশ্বাস, মনি খাঁ, তারপর ওই—

তারাপদ বিশ্বাস, মানে বটতলা রোডের মোড়ে যাঁর বাড়ি?

হ্যাঁ, কেন?

না, কিছু না। আচ্ছা তুমি গোড়া থেকেই নাগরিক সমিতির সঙ্গে ছিলে, তুমি কি শীতল কাকা বিনোদ কাকাদের সঙ্গে একমত?

কমলেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন। সন্ধে নেমেছে, হাঁটতে হাঁটতে ঝিলের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ওঁরা। ঝিরঝির বাতাস ঠাণ্ডা আমেজ নিয়ে আসছিল। কমলেশ বললেন, চল, একটু বসি ঝিলপাড়ে, মিটিং শুরু হতে এখনও কুড়ি-পঁচিশ মিনিট বাকি।

ঝিলপাড়ে পার্কের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে কমলেশ শুরু করলেন—জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, বাঁশঝাড় হোগলাবন থেকে আজকের এই সুজনডাঙা, সত্যি বলতে কী এক একসময় স্বপ্নের মতো মনে হয়। এত বছর ধরে কত কিছু দেখলাম শুনলাম, মানুষের চিন্তা-ভাবনার মত দৃষ্টিভঙ্গি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। অন্তত যে মানুষ যথাসম্ভব জীবনকে খোলা চোখে খোলা মনে নিতে পারে, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিদিন শিখতে চায়। শীতল বিনোদরা যা বলছে, আমার মতে তা হয়তো পুরোপুরি ঠিক নয়, আবার পুরোপুরি ভুলও বলা যায় না, অন্তত এই বয়েসে এসে এখন আমার এই রকমই মনে হয়। কলোনি কো-অপারেটিভ থেকে সুজনডাঙার যে কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রথম কুড়ি বছর বলতে গেলে ধীরেনবাবুর ইচ্ছাই ছিল শেষ কথা। যে কোনো পরিকল্পনা, চাকরি-বাকরি সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনিই নিতেন। বলতে পারিস ওয়ান ম্যান শো, তাঁর অনুগত লোকজনের নির্দেশ পালন ও সভায় হাততোলা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা ছিল না। ডিক্টেটর? স্বৈরাচারী? হ্যাঁ তবে সদাশয় স্বৈরাচারী কি না সে কথা ভাববার। অসম্ভব কাজপাগল মানুষ ছিলেন, প্রথম দিকে কলোনি গড়ার নানা কাজে থেকেছি তাঁর সঙ্গে, অনেক অনুষ্ঠানেও গেছি, দেখেছি যেখানেই যেতেন মুহূর্তে পুরো পরিবেশ নিজের কর্তৃত্বে এনে ফেলতেন। কাজ আদায় করে আনতে তাঁর জুড়ি ছিল না। এসডিও অফিস ডিএম অফিস থেকে রাইটার্স পর্যন্ত সর্বত্র, পিওন থেকে টপ অফিসার সবাই তাঁর গুণমুগ্ধ, পিওনদের সঙ্গেও খুব ভালো ব্যবহার করতেন, মাঝে মাঝে বকশিস দিতেন আর বলতেন ওপর থেকে নীচু সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকলে কাজ আদায়ে কোনো গোলমাল হয় না। দ্যাখ্ মাঝেরগ্রাম আর সুজনডাঙা প্রায় একই সময়ে

পাশাপাশি দুটো জায়গা উদ্বাস্তু কলোনি হিসেবে হাঁটতে শুরু করেছিল, বরং মাঝেরগ্রাম কয়েক মাস আগেই শুরু করে এবং ওদের একটা রেলস্টেশনও ছিল, অথচ সব ব্যাপারে সুজনডাঙা এগিয়ে গেছে দুড়দাড় করে। মাঝেরগ্রামের আগে সুজনডাঙার স্কুল অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি পঁয়ষট্টি সালে আর মাঝেরগ্রাম তার তিরিশ বছর পর, ব্যাঙ্ক বল কলেজ বল সবকিছুই আগে সুজনডাঙায়, এর পেছনে ধীরেনবাবুর কৃতিত্ব মানতেই হবে—মজার ব্যাপার হল এখানে যে শরণার্থীরা প্রথম এসেছিলেন তাঁরা প্রথমে মাঝেরগ্রামেই আশ্রয় চেয়েছিলেন, কিন্তু ততদিনে বেশ কিছু মানুষ মাঝেরগ্রামে আশ্রয় নিয়ে বসবাস শুরু করে দিয়েছেন, ওদের কলোনি কমিটি জায়গার অভাবে রাজি হল না, তখন পাশের বাঁশবন কেটে—না হলে হয়তো সুজনডাঙা নামে কোনো জনপদ সৃষ্টিই হত না। অনেক কাজ করেছেন মানুষটা, যে কাজ করে তাঁর ভুল হয়, কাজ না করলে ভুলের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আজ যাঁরা সুজনডাঙার কাজেকম্মে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের কি কোনো ভুল হচ্ছে না? তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে বহু মানুষের তিনি নানারকম উপকার করেছেন, বহু গরিব পরিবারকে নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন—অনেকে বলে এইসব উপকার বা সাহায্য সব তাঁর প্রভাব বিস্তারের জন্যে বা অনুগত বাহিনী তৈরির জন্যে, তবু ভালো কাজ তো ভালোই থাকে, সেইসব উপকৃত মানুষদের সঙ্গে কথা বললেই বুঝবি কী গভীর শ্রদ্ধা তাদের ধীরেনবাবুর প্রতি।

একটানা বলে থামলেন কমলেশ। পার্কে দু-চারটে বাচ্চা হইচই করছে, দোলনা চড়ছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা বেঞ্চিতে বসে আছেন অনেকে। দু-চারজন বৃদ্ধ মানুষ, বাচ্চাদের মায়েরা, ঘুঙুরের শব্দ তুলে 'ঘটিগরম' 'ঘটিগরম' বলে এক চানাচুরওয়ালা হাঁক দিয়ে গেল।

দ্যাখ নিরু, আমরা সাধারণ মানুষজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে কোনো মানুষকে সাদা বা কালো হিসেবে দেখতে চাই, আর তিনি যদি নামকরা কেউ হন তবে তো কথাই নেই। দেখবি যাঁকে আমরা মহৎ ভাবি তাঁর কোনো সমালোচনাই আমরা শুনতে চাই না। যেন তাঁর কোনো দোষ থাকতে পারে না, তিনি কোনো অন্যায় করতে পারেন না, তিনি এক দেবতা। দোষ-ত্রুটি নিয়েও মানুষ যে কিছু ভালো কাজ করতে পারেন একথা আমরা ভুলে যাই। যাঁকে কোনো কারণে শয়তান হিসেবে দেগে দিয়েছি আমরা, তিনি যেন কিছুতেই জীবনের কোনো ক্ষেত্রে একটিও ভালো কাজ করতে পারেন না। একটু আগেই দেখলি তো, ওরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল, একদল ধীরেনবাবুকে ভগবান বানাতে চায় আর অন্য দল—

পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিলেন কমলেশ। চুপ করে শুনছিল নির্ঝর, আর শুনতে শুনতেই ভাবছিল, সে দেশ-বিদেশের অনেক খবর রাখে, অনেক ইতিহাস জানে, প্যালেস্তাইনের যুদ্ধ থেকে কলকাতার জন্মকথা—কিন্তু নিজের জন্মস্থান

সম্পর্কে জানে খুবই সামান্য। তার মনে হচ্ছিল একজন বন্ধু যেন হাত ধরে তাকে চিনিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে তার জন্মশহরের গড়ে ওঠা বেড়ে ওঠার নানা কথা-কাহিনি, কিছু প্রশ্নও জন্ম নিচ্ছিল, সুজনডাঙার অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়তো এক ময়দানবের কথা মনে করিয়ে দেয় কিন্তু সে ময়দানব কি এক ব্যক্তি নাকি সমষ্টি? সে ব্যক্তি যতই অসাধারণ কর্মযোগী পুরুষ হন না কেন তবুও একা এক ব্যক্তির পক্ষে কি সম্ভব এই নির্মাণ?

কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল এক আবেশের মধ্যে আছেন তিনি, একটা ঘোর—প্রশ্ন করে সে ঘোর ভাঙতে চাইল না নির্ঝর।

কমলেশ আবার শুরু করলেন—খুব ডিসিপ্লিনড ছিলেন ধীরেনবাবু, সব কাজ ঘড়ি ধরে, ভোর চারটে থেকে রাত এগোরোটা নিখুঁত রুটিনে, যে কোনো সভায় নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত— এই ধানক্ষেত জলা জায়গা কোনো বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় কি সরাসরি সরকারি পরিচালনায় আজকের নগর হয়ে ওঠেনি, প্রথম দিকে অল্প কিছু জবরদখল জমি থাকলেও বেশিরভাগই জমির মালিকদের কাছ থেকে কিনে সোসাইটির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে—লিগালি সরকারি নোটিস দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করে সেই জমি বিলি করা নিয়ে অনেক গোলমাল থাকলেও—এতবড়ো নগর গড়ে তোলা কি চাট্টিখানি কথা! দেশের কত বিশিষ্ট মানুষ; মন্ত্রী, সমাজসেবী, সাহিত্যিক একসময় উদ্বাস্তু কলোনি হিসেবে সুজনডাঙার এত দ্রুত উন্নতির প্রশংসা করেছেন, গুন্টার গ্রাস এসেছিলেন একবার—আর এইসব কাজের কর্ণধার যিনি, স্বেচ্ছাচারী হলেও তাঁকে চোর-বদমাশ-স্বার্থপর বলে উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় ঠিক নয়—

বলতে বলতে উত্তেজিত কমলেশের স্বর চড়ে গিয়েছিল, থেমে স্বর একটু নামিয়ে আবার শুরু করলেন—সে সময় আজকের নেতা বা সমাজসেবীদের মতো এত গাড়ি চড়ে কাজ করার অবস্থা ছিল না, ট্রাম বাসে চড়ে, প্রয়োজনে মাইলের পর মাইল হেঁটেও অনেক কাজ করতে হয়েছে, তাছাড়া উনি কিন্তু প্রথম দিকে রাজনীতি করতেন না, রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছেন অনেক পরে, এর বিরোধী আমাদের নাগরিক সমিতির মধ্যেও সব রাজনৈতিক দলের লোকেরাই ছিলেন, আর উনিও রাজনীতির রং দেখে কোনো কাজ করতেন না, ওঁর কাছে যাকে গুণী মনে হত তাকেই—

তুমি যা বললে তাতে তো সুজনডাঙার ঘরে ঘরে ওঁর ছবি থাকা উচিত, কিন্তু—

কমলেশ থামিয়ে দিলেন হাত দেখিয়ে, যা বললাম তা সাদা-কালো রং থেকে সাদাটুকু আলাদা করে বেছে নিয়ে, কালোটা বলিনি এখনও, কালো না থাকলে কেনই বা নাগরিক সমিতি তৈরি হল? ওঁর সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি ছিল মতের বিরুদ্ধতা সহ্য করতে পারতেন না উনি, সবসময় একনায়কের মনোভাব, সকলকে নিয়ে চলতে পারলে আজ তুই যা বললি হয়তো তা-ই হত—

নাগরিক সমিতি কেন তৈরি হল?

দ্যাখ, সোসাইটির সদস্যদের জমির দলিল পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, কারণ সরকারি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জমির মালিকরা বেশি টাকার ক্ষতিপূরণের দাবিতে কোর্টে গেলেন, সরকার তিনটে স্কিমে—

মোট কথা জমির দলিল দেওয়া নিয়ে জটিলতা—এই তো?

সংক্ষেপে বললে তাই, তা সেই জটিলতার কথা সোসাইটির সদস্যদের খোলাখুলি জানানো হল না, সদ্য জমি বাড়ি খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যে মানুষগুলো এসেছেন, তাঁদের উদ্বেগ তো স্বাভাবিক, কিন্তু সেই উদ্বেগকে বোঝার চেষ্টা করলেন না সোসাইটির সর্বময় কর্তা ধীরেনবাবু এবং তাঁর অনুগত পরিচালকেরা, সোসাইটির কাজকর্মে স্বচ্ছতার অভাব, গণতন্ত্রের অভাব, স্বজনপোষণ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ—

কী রকম দুর্নীতি?

নানারকম, যেমন ধর সোসাইটির উদ্যোগে ঝিল কাটা বা বাড়ি তৈরির সঠিক মজুরি না দেওয়া কিংবা কৃষি খামারের জমি প্রচুর টাকা নিয়ে গৃহস্থ বাড়ি তৈরির জন্য বিক্রি করে দেওয়া—এ সবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেই নাগরিক সমিতির জন্ম, সোসাইটির নির্বাচনে কারচুপি—

কারচুপি—

হ্যাঁ, নাগরিক সমিতির চাপে যে নির্বাচন হয়েছিল সেখানে পর্দানশীন মহিলাদের জন্য প্রক্সি ভোটের ব্যবস্থা করে ধীরেনবাবু সোসাইটিতে তাঁর গোষ্ঠীকে জিতিয়ে আনলেন—

তার মানে ফলস ভোট-টোট তখনও ছিল?

তখন কেন, তার অনেক আগে থেকেই, এমনকি ব্রিটিশ আমলেও ছিল। তা, নাগরিক সমিতির আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন এর যারা প্রধান নেতা ছিলেন ; যেমন তুহিন গুপ্ত, শ্যামল ঘোষ এঁদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হল—নাগরিক সমিতির সদস্যদের সোসাইটি মেম্বারশিপ কেড়ে নেওয়া হল—

ধীরেনবাবুর সাদা না কালো কোন্ দিকটা বড়ো তোমার কথা শুনে সেটা বুঝে উঠতে কেমন কনফিউজ লাগছে—

ম্লান হাসলেন কমলেশ। বললেন, আগেই বললাম সব কিছু ছাপিয়ে ওঁর সবচেয়ে বড়ো দোষ ছিল স্বেচ্ছাচারী একনায়কের মনোভাব! প্রয়োজনে বিরোধীদের পুলিশ দিয়ে বা গুণ্ডা লাগিয়ে হেনস্থা করতেও পিছপা হতেন না! আবার গুণের কথাও তো বলেছি।

আচ্ছা জেঠু, শুনেছি নাগরিক সমিতি, রাজ্যের বিরোধী দলগুলো পঁয়ষট্টি সালে সুজনডাঙায় মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল, তুমুল আন্দোলন করেছিল, কেন? ট্যাক্স বাড়বে, এজন্যে?

সেসব অনেক কথা, ট্যাক্স বাড়াটা বড়ো কথা ছিল না, ওপার বাংলা থেকে আসা হতদরিদ্র মানুষজন দুর্মূল্যের বাজারে বেশি বেশি ট্যাক্সের বোঝা চাপার ভয়ে অনেকেই

হয়তো মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে ওঠার বিরোধী ছিলেন। বিশেষত যেখানে, আশেপাশের অনেক পুরনো অঞ্চলেও তা হচ্ছে না, কিন্তু তবুও বিরোধিতার এ কারণটা ছিল গৌণ।

তা হলে?

আসলে সুজনডাঙার বেশিরভাগ মানুষ এবং নাগরিক সমিতি চাইছিল যে সরকারের সঙ্গে জমির দলিল সমস্যার ফয়সালা হোক, জমির মালিকানার নিশ্চয়তা নেই অথচ মিউনিসিপ্যালিটি, এ কেমন ব্যাপার? মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠায় ধীরেনবাবুর এত উৎসাহকে অনেকেই মনে করছিলেন দলিল সমস্যা থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, তাছাড়া যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান হবেন সরকার মনোনীত এবং সে পদ ধীরেনবাবু পাবেন এটা প্রায় সকলেই জানতেন সেক্ষেত্রে ওঁর স্বেচ্ছাচারিতা আরও বাড়বে সে আশঙ্কাও ছিল—বলতে বলতেই হাতঘড়িতে চোখ ফেলে জিভ কাটলেন কমলেশ, ইস দেরি হয়ে গেল।

কিন্তু মিউনিসি—

আজ আর নয়, পরে, তুই উঠবি না?

না, একটু পরে, যাও তুমি।

কমলেশ চলে গেলেন দ্রুত পায়ে। পার্ক ফাঁকা হয়ে গেছে, নির্ঝর ছাড়া দূরে আরেকটা বেঞ্চিতে বসে আছে একজন। এ সময় এত ফাঁকা থাকার তো কথা নয়, গরমের সন্ধ্যায় এমন ঝিরঝির বাতাস—আজ কি তাহলে টিভিতে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান, খেলা-টেলা নাকি সিনেমা?

সিগারেট ধরায় নির্ঝর। ঝিলের ওপর দিয়ে বয়ে আসা ফুরফুরে হাওয়া বেশ লাগছিল।

নির্ঝর ভাবছিল ধীরেনবাবুকে নিয়ে সুজনডাঙায় কত গল্প চালু আছে, এর কোন্‌টা কতখানি সত্যি বা মিথ্যে কে জানে! একবার নাকি সুজনডাঙায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের এক সভায় বক্তৃতার মাঝখানে কয়েকজন শ্রোতা উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ধীরেন বসু সরকারি টাকা চুরি করেন, ওঁকে আপনি টাকা দেন কেন? শুনে প্রফুল্ল সেন নাকি হেসে বলেছিলেন, আমি জানি উনি চুরি করেন, ওঁকে দশ হাজার টাকা দিলে উনি চার হাজার টাকা সরান। ছয় হাজার টাকা উন্নয়নে খরচ করেন। কিন্তু আপনাদের মতো অনেকেই আছেন যাঁরা পুরো দশ হাজার টাকাই আত্মসাৎ করে দেন। ধীরেনবাবু কাজ না করলে সুজনডাঙার এত উন্নতি হল কী করে!

ঝিরঝির হাসির ভেতরেই আরও একটা গল্প মনে পড়ল নির্ঝরের। পাশের মাঝেরগ্রামে রেলস্টেশন ছিল স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই, ওদিক থেকে সুজনডাঙায় আসতে হত স্টেশনের ওপর দিয়ে খাল পেরিয়ে, কারণ তখনও এই দুই কলোনির কোনো লিংক রোড হয়নি। এদিকে একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেও কয়েক বছরের মধ্যেই সুজনডাঙা সব দিক থেকে এগিয়ে যাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল ধীরেনবাবুর নাম। মাঝেরগ্রামের সঙ্গে

খানিকটা রেষারেষিও ছিল। তা, গল্পটা হল, সুজনডাঙায় রেলস্টেশন হওয়ার বছর দুই আগে থেকে ধীরেনবাবু নাকি মাঝেরগ্রাম স্টেশনের ওপর দিয়ে হাঁটতেন না, স্টেশনের পাশের ঝোপ-জঙ্গল মাড়িয়ে হেঁটে যেতেন। কারণ, কারা নাকি ধীরেনবাবুকে শুনিয়ে বলেছিল—ওঁনার শুনি এত ক্ষমতা, তা উনি সুজনডাঙায় স্টেশন করে নিন। মাঝেরগ্রাম স্টেশন দিয়ে হাঁটেন কেন!

এরকম কত গল্প, অতিকথা যে ছড়িয়ে আছে ধীরেনবাবুকে নিয়ে—কিন্তু সব আলো তাঁর মুখে কেন? আরও কত মানুষ ছিলেন। যাঁদের ত্যাগ, পরিশ্রম, মেধা, পরিকল্পনায় তিলতিল করে গড়ে উঠেছে এই উপনগর?

বিশেষ করে যাঁরা ভদ্রলোক বাবু নন, বিনা মজুরিতে বা খুব কম মজুরিতে জঙ্গল কাটলেন, মাটি ফেলে বসবাসের জমি তৈরি করলেন, কখনও স্থানীয় জমির মালিকদের সঙ্গে লড়াই করে দখল রাখতে গিয়ে মার খেলেন, যাঁরা মারাত্মকভাবে আহত হলেন, তাঁদের কথা ভুলে গেল সবাই। তাঁদের বেশিরভাগের নামও আজ আর মনে রাখেনি কেউ। সোসাইটির পঞ্চাশ বছরেও কি তাঁদের সেভাবে স্মরণ করা হল?

এরকম হয় বোধ হয়, নীচুতলার যে মানুষজন পরিশ্রম করেন অথচ গরিব শিক্ষাহীন তাঁরা বোধহয় চিরকাল বঞ্চিতই থেকে যান—সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে! এর আগে একদিন তার জেঠুর কাছে শুনেছিল নির্ঝর—সেইসব মানুষদের অনেকে এখানে জমি পাননি, চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন দণ্ডকারণ্যে কী আন্দামানে!

সুজনডাঙা নিয়ে তার লেখায় সেইসব মানুষদের কথা বলতে হবে, জানতে হবে তাদের কথা যথাসম্ভব—কিন্তু আপাতত প্রুফ দেখা জরুরি, শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল নির্ঝর।

## চার

দরজা খুলে যেন অবাক হয়েই বেশ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকে সুরমা। সদ্য স্নান সেরেছে, হালকা হলুদ নাইটি, মাথায় তোয়ালে জড়ানো।

ঢুকতে দেবে না?

মনে পড়ল এতদিনে!

প্রায় তিন-চার মাস পরে এ বাড়িতে এল নির্ঝর। সুরমার গা থেকে মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিল, সোফায় বসতে বসতে বলে, জল খাওয়াও।

দেব, রোদ্দুর থেকে এলে, একটু জিরিয়ে নাও।

ফুলস্পিডে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে সুরমা ভেতরে যায়। এ ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। এর ওপর

দোতলায় ঘর আছে, তাছাড়া পুব-দক্ষিণের রোদ্দুর ঢোকে না। বাইরে চড়া রোদ, তবে ঘাম হচ্ছে না সেরকম। নির্ঝর লক্ষ্য করে ঘরে নতুন কয়েকটা স্টিলের র‍্যাক এসেছে, আসবাবপত্র এদিকে ওদিকে নতুন করে সাজানো।

এ বাড়ির সঙ্গে বসু পরিবারের দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। সুরমার শ্বশুরমশাই সুবিনয় আর কমলেশ অনেক দিনের বন্ধু। নির্ঝরও খুব ছোটো থেকেই আসে এখানে। সুবিনয় এখন শয্যাশায়ী, গত তিন-চার বছর ধরে এরকমই চলেছে। সেরিব্রাল অ্যাটাকের পর বাঁদিকটা প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। এক সময় উনিই ছিলেন সুজনডাঙার সবচেয়ে ধনী মানুষ। চায়ের পাইকারি ব্যবসা ছিল। এখন ব্যবসার সে রমরমা আর নেই। চার ছেলের মধ্যে সুরমার বড়ো ভাসুর ব্যবসা দেখে, থাকে না এ বাড়ি। লেকটাউনে ফ্ল্যাট কিনেছে।

দক্ষিণ দিকে লম্বা টানা একটা ঘর আছে। বিশাল লাইব্রেরি সে ঘরে। সে লাইব্রেরি সুবিনয়ের বাবা মহীতোষের। ওপার বাংলা থেকে চলে আসার সময় অন্য কী ফেলে আসলেন এ নিয়ে মহীতোষের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু সর্বদাই বিষণ্ণ হয়ে থাকতেন ফেলে আসা বইয়ের ভাণ্ডারের কথা ভেবে। সুবিনয় পরে বাবার জন্যে এই লাইব্রেরি তৈরি করে। এর টানেই কমলেশ প্রায়ই আসতেন, সঙ্গে আসত নির্ঝর। এখন অবশ্য সুরমা ছাড়া এটা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। অবশ্য কেই বা আছে? সুরমার স্বামী প্রশান্ত অধিকাংশ সময় অফিসের কাজে বাইরে ট্যুরে যায়। ওদের একমাত্র ছেলে ক্লাস এইটের বুবুন। সুরমার শাশুড়িও চলে গেছেন বছর চার-পাঁচ। প্রশান্ত ছাড়া অন্য কোনো ছেলেই বাবার সঙ্গে থাকে না।

প্রশান্তও বাইরে ছিল, মুম্বইতে, বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ট্রান্সফার নিয়ে চলে এসেছে।

সোফা ছেড়ে বইয়ের র‍্যাকের সামনে দাঁড়ায় নির্ঝর। পুরনো লাইব্রেরির বইপত্র যেমন সুন্দর করে গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখেছে সুরমা, তেমনই নতুন বইপত্রও কিছু এ ঘরে র‍্যাকে আলমারিতে নিয়ে এসেছে। মহীতোষের মৃত্যুর পর বাবার স্মৃতিতে সুবিনয়ের উদ্যোগে লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে একটা ট্রাস্ট তৈরি হয়েছিল, ওর অসুস্থতার পর সেটার কাজকর্মও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু বছরে একবার দুস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু বইপত্র দান আর নতুন কিছু বই কেনা, এটুকু চালু আছে এখনও।

র‍্যাক থেকে জীবনানন্দের 'সুতীর্থ' উপন্যাসটা টেনে নেয় নির্ঝর। জীবনানন্দের 'মাল্যবান' উপন্যাস ছাড়া তাঁর গল্প-উপন্যাস কিছু পড়েনি সে। সুতীর্থর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে পড়ে মাল্যবান বেশ ভালো লেগেছিল, একদম অন্যরকম।

মিষ্টি গন্ধে টের পায় ঘরে ঢুকেছে সুরমা। বই রেখে ফেরে নির্ঝর, জল নয়, সুরমার হাতে সরবতের গ্লাস।

বল।

কী বলব? কিছু বলার কৈফিয়ত নিয়ে আসতে হবে নাকি!

সুরমা ভ্রূ ওপরে তুলে একটা ভঙ্গি করে, সেদিন বাবুর যা রাগ দেখলাম! নাও লেবুর সরবত।

এক চুমুকে সরবত শেষ করে টেবিলে গ্লাস নামায় নির্ঝর, বলে, ভালো লাগছে না!

কী হল?

দীপাকে চিনতে তুমি?

দীপা? না ঠিক...

আমাদের পাড়ার মেয়ে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় স্বপনদা, ওর বোন।

ও।

মারা গেছে গতকাল।

ওমা! কী করে?

আমাদের হাসপাতালে কাল—

ও, সে তো শুনেছি, আহারে! এই নিয়ে খুব গোলমালও হয়েছে শুনলাম, ভাঙচুর, পুলিশ লাঠি চালিয়েছে নাকি!

হ্যাঁ, যে রকম হয় আর কী!

বাচ্চাটা বেঁচে আছে?

হ্যাঁ। রাতে বাচ্চা ও মাকে বেড়ে দেখে বাড়ির সবাই চলে আসে। ভোরবেলায় হাসপাতাল থেকে ফোন আসে, ওরা গিয়ে শোনেন ব্লিডিং হচ্ছে।

এর আগেও কয়েকটা এরকম কেস—যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে হাসপাতালটা।

কেন? অন্য কোনো হাসপাতালে রোগী মরে না?

না, তা বলছি না,—সে যদি বল আজকাল সব হাসপাতালেই—

হাসপাতালে কি রোগী শুধু মরে, বেঁচে ফিরে আসে না?

ওরকম পেঁচিয়ে কথা বলছ কেন? আমি কি তাই বললাম?

দেখ সুরমা, হাসপাতাল বল আর নার্সিং হোম বল, অল্প কিছু ঘটনা বাদে রোগী সুস্থ হয়েই ফেরত আসে, কিন্তু—

সব কিছু ঠিকঠাক চলছে বলছ, কোথাও কোনো গাফিলতি নেই?

অবশ্যই আছে, ডাক্তার বল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বল গাফিলতি আছেই, কিন্তু তাই বলে সব ক্ষেত্রে নয়। রোগী মরে গেলেই যদি এখন হাসপাতাল ভাঙচুর হয়, পুলিশ ডাকতে হয়—রোগী হাসপাতালে মরবে না তো কি সিনেমাহলে মরবে!

গাফিলতি, দায়িত্বহীনতার ব্যাপারটাকে তুমি কিন্তু খুব হালকা খুব স্বাভাবিক করে দিতে চাইছ!

মোটেই না, আসলে আমার আপত্তি সমস্যার রুটে না গিয়ে তাকে কেন্দ্র করে হইহট্টগোল, সস্তা রাজনীতি, এর আগে সুজনডাঙা হাসপাতালে এরকম বিক্ষোভের ঘটনা অন্তত চার-পাঁচবার ঘটেছে, কী লাভ হয়েছে? যারা দলবল নিয়ে এসে হাঙ্গামা করেছে তাদের সবাইকে আমি চিনি, তারা স্রেফ রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে চায়!

কিন্তু—

শোন, যখনি গোলমাল বাধে তখন যে দল হাসপাতাল বা মিউনিসিপ্যালিটি চালাচ্ছে তারা ঘটনাটার মধ্যে যদি কোনো গাফিলতি থাকে ত্রুটি থাকে সেটা আড়াল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পুরো ব্যাপারটা তখন এ দল বনাম ও দল হয়ে যায়। অথচ যারা, যে নেতারা এত বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা কি সমস্যা সমাধানে কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছেন, ভবিষ্যতে গাফিলতি এড়াতে কী করলে ভালো হয় সে ব্যাপারে সাজেশন আছে তাঁদের— তা, না, অপদার্থ পৌরপ্রধানের পদত্যাগ চাই—এই শ্লোগান দিয়েই সব শেষ! কলকাতার সরকারি হাসপাতালের কথা ছাড়, আমাদের এই লোক্যাল মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে কিছু ডাক্তার বাদে হানড্রেড পার্সেন্ট স্টাফ এখানকার, পরিচালন সমিতিতেও লোকাল ডাক্তার সহ নানা দলের কাউন্সিলার আছে—চেষ্টা করলে ত্রুটিগুলো কাটিয়ে তোলা যায় না?

কীরকম?

ধর, একটা ঘটনা বলি তোমায়, আমার এক বন্ধুর মায়ের অপারেশনের পর ফিমেল ওয়ার্ডে ভিজিটিং আওয়ারে দেখতে গিয়েছিলাম তাকে, বাইরে চটি খুলে ঢুকতে হল, খুব ভালো, ভেতরে খালি পায়ে ঢুকতেই দেখি ওয়ার্ডময় পুরু ধুলো, আয়ারা হাওয়াই চটি পরে ঘুরছে, সেই চটি পরেই হাসপাতালের সর্বত্র ঘুরছে তারা, এমনকি বাইরে রাস্তাতেও চলে আসছে।

কার দোষ? হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নয়? হসপিটালের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হেড হিসেবে চেয়ারম্যান কি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন?

ঠিক, পারেন না, কিন্তু মেট্রন থেকে আয়া পর্যন্ত সবাই আমাদের সুজনডাঙার মানুষ আর যাঁরা বিক্ষোভ করেন তাঁরা কি স্পেসিফিক ভাবে এইরকম অবস্থাগুলো নজরে এনেছেন?

চুপ করে থাকে সুরমা। নির্ঝর শার্টের ওপরের দুটো ঘরের বোতাম খুলে ফেলে। হাত ছড়িয়ে এলিয়ে বসে সোফায়।

আসলে আমরা সব পচে গেছি, সবাই—চেয়ারম্যানের কাছে যাও, হাসপাতালের সব ভালো বলতে হবে, কিছু খারাপ বললেই তুমি প্রতিক্রিয়াশীল, আবার যারা বিরোধী দলের লোক তারা খানিকটা বিক্ষোভ করেই খালাস—

তুমি যা বললে হাসপাতালের অবস্থা, বাবা! আমি কোনোদিন যাইনি ওখানে, রোগী সুস্থ হবে কী করে?

তোমার মতো সবার তো আর শঙ্কর নেত্রালয় কি বেলভিউ কি উডল্যান্ডসে যাওয়ার পয়সা থাকে না!

ভালো হবে না কিন্তু! বড্ড বেড়েছ তুমি! আজও কি ঝগড়া করতে এসেছো?

হাসে নির্ঝর, শব্দহীন হাসতে হাসতেই মটমট করে হাতের আঙুল ফোটায়। গালে না কামানো খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, ভুল বলিনি বোধ হয়। পঞ্চাশ বছর আগে হোগলাবন ধানক্ষেত বাঁশঝাড়ের জায়গাটায় একটা হাসপাতাল, সরকারি সাহায্য সামান্য, এলাকার মানুষের শ্রমে অর্থে গড়ে ওঠা, প্রতিদিন কত লোক এখানে ট্রিটমেন্ট পায় জান?

তুমিই বললে-তো ওয়ার্ডের যা অবস্থা, আমি তাই—

সেটা সত্যি, এখন যা বলছি তাও সত্যি। অবশ্য আমিও মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলি বটে হাসপাতাল না কচু! তখন জেঠু বলে, তোরা সব ব্যাপারে কেবল নেগেটিভ দিকটাই বড়ো করে দেখিস? তাই কি? কী বল?

জানি না।

ধীরেনবাবু যাট-একষট্টিতে বিল্ডিংটা তৈরি করে দিয়েছিলেন, কিছুদিন মাতৃসদন চালু হয়ে গিয়েছিল, তারপর নব্বুইতে কো-অপারেটিভ-এর কাছ থেকে মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে নিল, এগারো-বারো বছরে আউটডোরে এত স্পেশালিস্ট, প্যাথোলজি, এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি থেকে নানা অপরেশন, গলব্লাডার অপারেশনও হয় এখানে। মিউনিসিপ্যালিটি যখন চালু করল, বিরাট ফাংশন করেছিল, বহু শিল্পী বিনা পয়সায় অনুষ্ঠান করে গিয়েছিলেন, তা ছাড়া সুজনডাঙার কত মানুষ যে অর্থ সাহায্য করেছেন, এখনও করছেন—

ফোন বাজে। সুরমা উঠে ভেতরে যায়। সোফায় পা মেলে আধশোয়া নির্ঝর। মাথা টিপটিপ করছে, চোখ বুজে ফেলে।

ফোনে কথা সেরে সুরমা সুবিনয়ের ঘরে যায়, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত ইশারায় ডাকে মঞ্জুকে। মঞ্জু নার্স, সুবিনয়কে দেখাশোনার জন্য দুজন নার্স পালা করে সকাল-রাত্রি থাকে। সুরমা বলে, সীমা ফোন করছিল, ছেলের জ্বর খুব, আজ বোধহয় আসবে না, তুমি যদি রাতে ডিউটি—

মঞ্জু চুপ করে থাকে। সুরমা বলে, আচ্ছা ঠিক আছে। ফিরে এসে হাতের কর্ডলেসটা ঠিক জায়গায় রেখে আবার চলে আসে বসার ঘরে। নির্ঝর চোখ বুজে শুয়ে আছে, মুখোমুখি সোফায় বসে। চুপ করে তাকিয়ে দেখে নির্ঝরকে।

গত চার বছর ধরে নির্ঝরের সঙ্গে একটু একটু করে কীরকম এক সম্পর্ক—প্রাণবন্ত

বন্ধুত্ব। তারপর কী বন্ধুত্বের সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমশ—উঠে পশ্চিমের জানালার কাছে যায় সুরমা, পর্দা তুলে দেয়, ঘর যেন বড়ো ছায়াচ্ছন্নতায় নিস্তেজ হয়ে আছে। এত ছায়া, এত আলোহীনতা ভালো লাগছিল না সুরমার। তার পনেরো বছরের বিবাহিত জীবন জুড়েই যেন এক বিষণ্ণ ছায়া, অথচ সে ছায়ার দহন ক্ষমতা খর রোদের থেকেও অনেক বেশি। প্রশান্ত সারাক্ষণ অফিস নিয়েই ব্যস্ত, বাড়িতেও গুচ্ছের ফাইল নিয়ে এসে দেখছে। একটু-আধটু সময় পেলে টিভির স্পোর্টস চ্যানেল খুলে বসে থাকে। মুম্বইতে যখন ছিল সেখানে কোয়ার্টারে বউরা মিলে একটা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি করেছিল, বুবুনও আরও ছোটো ছিল, দুই মিলিয়ে হইহই করে কেটে যেত সময়। কিন্তু সুজনডাঙায় এই বিশাল বাড়িটায় কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে।

হাই তুলতে তুলতে উঠে বসে নির্ঝর, বলে, তুমি কিন্তু একটু মুটিয়ে গেছ।

হ্যাঁ।

ডায়েট কন্ট্রোল করছ না?

না, কী হবে? না হয় একটু মোটাই হলাম।

বেশ ছিপছিপে ছিলে।

ধন্যবাদ।

প্রশান্তদা কি ট্যুরে? বুবুন কোথায়?

বুবুন মাসির বাড়ি আর তোমার প্রশান্তদা দিল্লি, কাল ফিরবে।

কী মেখেছ? গন্ধটা বেশ মিষ্টি!

তাই!

কেমন একটা নেশা ধরে যায়!

নেশা! শুধু গন্ধে!

তুমিও অবশ্য আমার কাছে ক্রমাগত একটা নেশার মতো হয়ে উঠছ।

কী রকম?

সেদিনের কথা কাটাকাটির পর ভেবেছিলাম আসব না আর, কিন্তু পারলাম কই? কী এক নেশার মতো—

থাক। স্নান করে নাও।

না, না, উঠব এখুনি।

উঠতে দিলে তো—স্নান করে খেয়ে তারপর।

না মানে—

চুপ।

ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে সুরমা, সে দৃষ্টির ভেতর থেকে শাসন ও মমতা ছাড়িয়ে কী এক শান্ত অথচ তীব্র আকুলতা! নির্ঝরের মনে হল

কপালের ওপর নুয়ে পড়ে সরু সরু সাপের মতো উড়ছে সুরমার চুল, দৃষ্টির গহন থেকে উঠে আসছে চাপা হাহাকার, হাহাকার না কি এক তৃষ্ণার ইশারা ছড়িয়ে পড়তে চাইছে ঘরময়! গা শিরশির করে ওঠে নির্ঝরের, বলে, একটা কবিতার কয়েকটা লাইন মনে পড়ছে, শুনবে?

চোখ সরিয়ে জানলার দিকে তাকায় সুরমা, উত্তর দেয় না।

মেয়েটি চোখ মেলল বাইরের আকাশে,
সে চোখে নেই নীলার আভাস, নেই সমুদ্রের গভীরতা
শুধু কীসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, কঠিন ইশারা,
কীসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে—

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে আবার সোজাসুজি তাকায় সুরমা, বলে, কার?

সমর সেন।

বাইরে খাঁ-খাঁ রোদ্দুর, পুড়ে যাওয়া বাতাস একটু একটু করে ঢুকে পড়ে শান্ত নিঝুম ছায়াচ্ছন্ন ঘরে।

## পাঁচ

ভোরের প্রথম ট্রেন চলে যেতে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল গৌরীর। বুকে চিনচিনে ব্যথা। জলতেষ্টা, অথচ উঠতে ইচ্ছা করে না।

উল্টোদিকে বেড়াঘেঁষা তক্তপোশে ছেলে আর মেয়ে ঘুমে ভিজে ন্যাতা। বাইরে অন্ধকার। বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে ভোরের হালকা হিম ঢুকছে, গত রাতে কালবোশেখীর পর বাতাসে ঠাণ্ডার ছোঁয়া।

রাতে ঘরে ফেরেনি ভোলা, গৌরীর মরদ। তা অবশ্য নতুন কিছু নয়, মাঝে মাঝে বাসেই রাত কাটায়, মদ খেয়ে অন্য কোথায় পড়ে থাকতে পারে। রেললাইন ধারের বস্তির অনেক ঘরেই, রাতে মরদ ফেরে না। গৌরীর তা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না খুব কিছু। কিন্তু তিন দিন আগে একটা ঘটনার পর মরদকে নিয়ে, রাতে ঘরে না ফিরলে, একটু ভাবনা হচ্ছে।

আপ ট্রেন একটানা হর্ন দিতে দিতে চলে যায়। ভোরবেলায় বড়ো বিকট লাগছিল একটানা ওই শব্দ। অথচ ঘুমিয়ে থাকলে ট্রেনের শব্দ টের পায় না গৌরী। কারণ সেই ছোটোকালের অভ্যেস। ইজের পরে আদুল গায়ে ঘোরা বয়েস থেকেই রেললাইন পাড়ে কাটাচ্ছে সে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে জংশন স্টেশনের দিকে যেতে রেললাইন ধারের

ঝুপড়িতে জন্ম, তারপর বেলেঘাটার বস্তি। কিছুদিন টিটাগড়ে কাটিয়ে গত সাত-আট বছর ধরে সুজনডাঙায়।

বাজারের উত্তরমুখ থেকে স্টেশন পর্যন্ত আবার স্টেশন পেরিয়ে বহুদূর রেললাইনের দুপাশে প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো ঘরের বাস। এদের বেশিরভাগই পুব বাংলা বা বাংলাদেশের মানুষ। বস্তি শুরু হয়েছিল একাত্তর সালে, তারপর কত পরিবার দশ-বিশ বছর কাটিয়ে চলে গেছে এদিক-ওদিক, জমি কিনে বাড়িও করেছে দত্তপুকুর বা গুমায়, সোদপুর রোডের দুধার, কামারগাতি বা তালবান্দায়। সুজনডাঙার পশ্চিম পল্লিতে। কিন্তু বস্তির ঘর খালি পড়ে থাকে না। বিক্রি হয়, চলে আসে নতুন নতুন পরিবার। আবার কেউ কেউ জমিয়ে রয়ে গেছে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। প্রায় ঘরেই পোর্টেবল সাদাকালো টিভি, কোনো কোনো ঘরে ফ্যানও ঘোরে, হুক করে নেওয়া কানেকশন। আবার বাজার মুখ থেকে স্টেশন পর্যন্ত সব ঘরে পান্তুর মিটার থেকে নেওয়া ইলেকট্রিক কানেকশন। মাসে মাসে পান্তুকে দিতে হয় পঞ্চাশ টাকা আর পান্তুর বন্দোবস্ত আছে ইলেকট্রিক অফিসের লোকজনের সঙ্গে। ইদানীং অবশ্য এই নিয়ে একটু গোলমাল হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে হুক যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে ইলেকট্রিক অফিস কড়া ব্যবস্থা নেবে, পান্তুর ব্যবসাও টলমল। বস্তির পুরুষদের নানা পেশা—রিকশা, সাইকেল ভ্যান চালানো, বাড়ি তৈরির জোগাড়ে, বাজারে সব্জি বিক্রি, কাঠের মিস্ত্রি, ট্রেনের হকার ইত্যাদি। মেয়েদের বেশির ভাগই আশপাশের বাবুদের বাড়িতে বাসন মাজা, জল তোলা, ঘর মোছা, এইসব কাজ করে।

বাইরে অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। বুকের চিনচিনে ব্যথা কমে না। মশারি ফাঁক করে হাত বাড়িয়ে দরজার কোনায় রাখা কাঠের ছোটো টুলের উপর থেকে জলের বোতল টেনে নেয় গৌরী। আধশোয়া হয়ে গলার ভেতর জল ঢালতে গিয়ে বিষম খায়। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে উবু হয়ে বসে প্রায় পুরো বোতল জল খেয়ে নেয়। মাটির মেঝে থেকে ঠাণ্ডা উঠছে, কাল বৃষ্টির পর সারা ঘরই স্যাঁতসেঁতে।

ভোলার কথা মনে হতেই, বুকের ভেতর খচখচ করে। পশ্চিমপল্লির কেনা জমিতে ঘর তুলতে গিয়েই গোল বেধেছে। গৌরীর জমানো টাকাতেই জমি কেনা হয়েছিল। পশ্চিমপল্লি মানে ২০নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার রবি মণ্ডল, তাঁর শ্বশুরবাড়িতে একসময় গৌরী কাজ করত। মানুষটিকে ভালো লাগে গৌরীর, বেশ ভক্তি আসে। জমি পছন্দের পর তাঁকে গিয়ে ধরতে তাঁরই মধ্যস্থতায় জমিটা কিনেছিল। তিনিই কাগজপত্রের লেখাপড়া সইসাবুদ, উকিল, মিউনিসিপ্যালিটির নিয়মকানুন সব সামলে দিয়েছিলেন।

গৌরীর উদ্যোগে হলেও, পুরো ব্যাপারটায় ভোলাও খুব খুশি হয়েছিল। গৌরী বুঝতে পারছিল খোকা যত বড়ো হচ্ছে ভোলাও যেন একটু সংসারী হয়ে উঠতে চাইছে। আগের তুলনায় মদ-জুয়া কমে আসছিল।

তা, মাস দুই আগে জমিতে ভিত কাটাল, একখানা ঘর তুলবে, একবারে তো হবে

না, একটু একটু করেই খাড়া করতে হবে। দিন পনেরো আগে জমিতে ইঁট-বালি পড়তেই গোলমাল। নজর পড়ল শকুনের। মোড়ের মাথায় নেপু মস্তান ডাক দিল ভোলাকে, বলল, মায়ের মন্দির হবে, পাঁচশো টাকা চাঁদা দিবি।

পাঁ-চ-শো, কোথায় পাব?

যেখান থেকে ইঁট-বালি-সিমেন্টের টাকা পাচ্ছিস!

অত টাকা হবে না, মায়ের মন্দির যখন—বিশ-পঞ্চাশ দেব।

পাড়ায় জমি কিনলি, ঘর তুলছিস—এক পয়সা খসালি না, বেশ মজায় আছিস না! শুয়োরের বাচ্চা। পাঁচশোর এক পয়সা কম হবে না—

গরিব লোক—

কথা বাড়ালে মিটার বাড়বে, সাতদিনের মধ্যে টাকা দিয়ে যাবি—যা ফোট!

ভোলা কথা না বাড়িয়ে হনহনিয়ে চলে এসেছিল। রাতে গৌরীকে সব বলতেই গৌরী বলেছিল, ব্যাপারটা রবি কাহারে বললি হয় না?

রবি মণ্ডল, ওর আর কোনো পাওয়ার নেই!

কী কও?

তোমার রবি কাহারে নেপুর দলবল পাত্তা দেয় না, পার্টিতে রবি কাহার পাওয়ার কমে গেছে।

তা হলিই বা, উনি মান্যিগণ্যি লোক!

এ মেয়েছেলেকে বোঝাই কী করে! আরে বাপু নেপুর যে বস্ হাতকাটা খোকন। তার সঙ্গে পার্টির অনেক বড়ো নেতা কাঞ্চন ঘোষের ওঠাবসা, ওসব এলাকায় এখন অনেক নতুন নতুন নেতা সব কাঞ্চন ঘোষের দলে—তোমার রবি কাহা কাঞ্চন ঘোষের দলে নেই।

এক পার্টির মধ্যে আবার অন্য পার্টি?

হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ, এক পার্টির মধ্যে দশ পার্টি ঠেসেঠুসে আছে।

তা হোক, তুমি না যাও, আমি যাব রবি কাহার কাছে।

না, শেষ পর্যন্ত রবি মণ্ডলের কাছে গৌরীর যাওয়া হয়নি, ভোলাও যায়নি। নির্ঝরকে জানিয়েছিল, সেও রবি মণ্ডলের সঙ্গেই কথা বলতে বলে, কিন্তু গোলমাল আর বাড়াতে না চেয়ে ভোলা একটা রফা করবে ভেবেছে। এদিকে নেপুর হুমকির পর সাতদিন কেটে গেছে। তাই ভয়ে ভয়ে আছে গৌরী, দিনকাল ভালো নয়। গরিবের ক্ষতি হতে কতক্ষণ। নেপুর দলবল যা খুশি করতেই পারে। রফা যখন করবে তা হলে দেরি কেন? গৌরী ভেবেছে পাঁচশো টাকা দিতে গায়ে লাগলেও, নেপুরা মানতে না চাইলে তা দিয়ে দেওয়াই ভালো! কিন্তু ভোলা বলছে এখানেই কি থামবে নাকি ওরা, অন্য ছুতোয় আবার চাইবে, তাই একটু দরদাম করা ভালো!

নানা কথা ভাবতে ভাবতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল গৌরী, বাইরে আলো

ফুটেছে, ট্রেনের হর্ন, লাইনের ধার থেকে সরে আসে। ট্রেনটা চলে যেতেই লাইন পেরিয়ে ডোবার ধারে নেমে আসে। ডোবার ওপর পায়ে চলা বাঁশের সাঁকো। সাঁকোয় পা রাখতে গিয়েও থেমে যায়। বাঁশের গা জড়িয়ে একটা মোটা সাপ—জলঢোঁড়া না কি অন্য কোনো—ধীরে ধীরে বাঁশ বেয়ে নেমে কচুবনের ভিতর ঢুকে যায়। সাঁকো পেরিয়ে বটগাছের তলা দিয়ে গলির ভেতর উঠলে পচাদার দোকান, এক টাকার মুড়ি কিনে রেখে যাবে ছেলের জন্যে। কদিন ধরে ছেলের শরীর ভালো যাচ্ছে না, পাতলা হাগছে, আবার হ্যাংলামো বেড়েছে খুব, দিনরাত খাই খাই।

আশেপাশের মধ্যে পচাদার দোকানই খুব ভোরে খোলা পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে বাকিও দেয় গৌরীকে, তবে লোকটার একটু গায়েপড়া স্বভাব, আকারে ইঙ্গিতে কিছু বলতে চায় গৌরীকে, গৌরী না বোঝার ভান করে থাকে। একদিন একা পেয়ে হাত চেপে ধরেছিল, গৌরী এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল, কী হচ্ছে? ভোলারে জানো তো, কেমন গোঁয়ার! জানতে পারলি—

অনেক টাকা বাকি পড়ে আছে রে!

মালগুলো আঁচলের খুঁটে বেঁধে পালিয়ে এসেছিল গৌরী। পাশের ঘরের মঞ্জু কাণ্ড শুনে বলেছিল, ভালোই তো, গতর ভাঙিয়ে খা—মেয়েমানুষের ওই একটাই অস্তর, যে যত ভালোভাবে গতর ভাঙাতে—

তা তুই গেলি পারিস বুইড়া শকুনটার কাছে, মুখঝামটা মেরে বলেছিল গৌরী।

আমাকে মনে ধরেনি বুড়ার, তোকে ধরেছে যখন—বলতে বলতে হাসিতে লুটিয়ে পড়েছিল মঞ্জু।

পচাদার দোকান বন্ধ। গৌরীর কপালে ভাঁজ। কী হল? তার মানে এখন বাজারের মোড়ে যেতে হবে—না, সময় নেই, বোস-বৌদির বর আটটার ট্রেন ধরে, ছটার মধ্যে গিয়ে কাজ শুরু করতে না পারলে বকাবকি করে খুব। ঘরের দিকে হাঁটা লাগায় গৌরী, মেয়েটার হাতে পয়সা দিয়ে বলে যাবে। জোর হাঁটতেই আবার সেই চিনচিনে ব্যথাটা বুক থেকে পেট, পেট থেকে পিঠের দিকে ছড়িয়ে যেতে চায়। তবু হাঁটার গতি কমায় না গৌরী, বোস-বৌদির হাঁড়ি হয়ে ওঠা মুখের কথা মনে পড়ে।

রোদ পড়ে রেললাইন চকচক করছিল।

## ছয়

চায়ে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বাইরে তাকান কমলেশ। হাতলওলা কাঠের চেয়ারে বেশ টানটান হয়ে বসা। জানলা দিয়ে গাছগাছালির ছায়ামাখা রোদ গড়িয়ে

পড়ছে। কোকিলের ডাক শুনে কাগজ রেখে কাপ হাতে জানলার ধারে চলে আসেন, জানলা থেকে ছয়-সাত ফুট ছেড়ে পাঁচিল, পুবদিকের ফাঁকা জায়গায় নারকেল, সুপারি, নিম, বেল, টগর, গন্ধরাজের জড়াজড়ি। দক্ষিণের পাঁচিলের ওধারে বেশ খানিকটা ন্যাড়া জমি পড়ে আছে। ফলে আলো-বাতাস খেলে ভালো। তবে কতদিন আর ন্যাড়া থাকবে বলা যাচ্ছে না, সম্প্রতি ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে মাপজোপ করে গেছে জমির মালিক, পুজোর পরে বাড়ি তুলবে।

দাদা কি বেরোবেন? রান্নাঘর থেকে গলা চড়িয়ে জানতে চান মল্লিকা।

হ্যাঁ, কেন?

ফেরার পথে পাতিলেবু—

আচ্ছা।

গত দু-তিনদিন শরীর ভালো যাচ্ছে না, একটু দুর্বল বোধ করছেন। এমনিতে আটাত্তরেও তিনি যথেষ্ট সুস্থ সবল, রোগ-বালাই বলার মতো সেরকম কিছু নেই। তবু সকালের দিকে কাজেকম্মে বেরিয়ে রোদ লেগেছে, তাতেই বোধহয় হেলে গেছে শরীরটা, ভেবেছিলেন কদিন আর সকালে বেরুবেন না, কিন্তু চেয়ারম্যানের ফোন এল একটু আগে মিউনিসিপ্যালিটি যেতে হবে।

সুজনডাঙার কী হল দিনে দিনে! না, শুধু সুজনডাঙাই বা কেন, পৃথিবীই এগোচ্ছে না পেছোচ্ছে বোঝা দায়। জীবনে কোনোদিনই তিনি 'হচ্ছে না' 'হবে না' 'কিছুই ভালো নয়' এমন ভাবনাকে প্রশ্রয় দেননি। মানুষের প্রতি আস্থা বিশ্বাস রেখেছেন বরাবর, কিন্তু তবুও আজকাল মাঝে মাঝে আকৈশোর লালিত আস্থা, বিশ্বাস টলে যাওয়ার উপক্রম হয়।

দু-একদিন আগেই খবর পেয়েছিলেন, ২১ নম্বর ওয়ার্ডে মসজিদপাড়ার রাস্তার নাম নিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে। কিন্তু সে যে এত গোলমেলে হয়ে উঠবে ভাবতে পারেননি। গোটা সুজনডাঙায় ওই ২১ নম্বর ওয়ার্ডেই সামান্য ক'ঘর মুসলমান পরিবারের বাস। পেছনের কয়েকটা গ্রামে অবশ্য তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তা, ওই মসজিদপাড়ায় বহু পুরনো একটা মসজিদ রয়েছে, এখন আর কেউ যায় না সেখানে। কিন্তু রাস্তার নাম রয়ে গেছে মসজিদপাড়া রোড। সম্প্রতি ওখানকার ওয়ার্ড কমিটি রাস্তাটির নতুন নামকরণ করতে চেয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল, ঝঞ্ঝাটের সূত্রপাত এখান থেকেই। ওয়ার্ড কমিটি অবশ্য নতুন নামকরণের প্রস্তাব সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, তবে প্রস্তাবটি পাঠানো হয়েছে পৌরসভায়। অঞ্চলের অধিবাসীদের একাংশ-সহ ওয়ার্ড কমিটির যাঁরা নতুন নামকরণের পক্ষে তাঁরা বলছেন, ধর্মস্থানের নামে রাস্তার নাম হওয়া নাকি সাম্প্রদায়িক চিন্তার ফসল! কিন্তু এলাকার সংখ্যালঘু মানুষজন সহ যাঁরা কমিটিতে নামকরণের বিরুদ্ধে তাঁরা

বলেছেন, সুজনডাঙায় বহু রাস্তার নাম আছে দুর্গাবাড়ি রোড কিংবা কালীবাড়ি রোড কিংবা মন্দিরতলা রোড, তাহলে সে সবও কি পরিবর্তন হবে? এখন বিষয়টি ঘিরে ঝগড়া-দ্বন্দ্ব থেকে মারামারিও হয়ে গেছে, সঙ্গে নানা রাজনৈতিক দলীয় উপদলীয় কোন্দল ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও মাঠে নেমে পড়েছে। এলাকায় পুলিশ পাহারা চলছে, মসজিদের পাশেও চব্বিশ ঘণ্টার পুলিশ পাহারা দিতে হয়েছে। এই বিতর্কের মধ্যে সুজনডাঙার মানুষ ছাড়াও জড়িয়ে পড়েছে আশেপাশের গ্রামের মানুষও, ইস্যুটিকে ঘিরে সম্প্রদায়গত ভাগাভাগি হয়ে এমন এক অবস্থা আগে যা ছিল তাই অর্থাৎ নাম থাকবে মসজিদপাড়া রোড, চেয়ারম্যানের এই ঘোষণাতেও প্রবল বিক্ষোভ। চেয়ারম্যান সুজনডাঙার বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে আলোচনায় বসতে চাইছেন, ২১নং ওয়ার্ডে সবাইকে নিয়ে সভা করতে চাইছেন, কমলেশকে সকালে ফোনে সে কথাই জানিয়েছেন।

সকালে খবর কাগজ খুললেই মন বিষণ্ণ হয়ে যায় কমলেশের, মন ভালো হওয়ার মতো খবর চোখে পড়ে না, দাঙ্গা, যুদ্ধ, মন্ত্রী-নেতাদের পুকুরচুরি—মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ একথা নিজের ভেতরে উচ্চারণ করতে করতেই প্রশ্ন জাগে তাঁর, শেষ জীবনে মানুষের প্রতি অবিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠছিল বলেই কি রবীন্দ্রনাথ ওই উচ্চারণে নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইছিলেন?

বেসিনে ওয়াক তোলার শব্দে কমলেশ বুঝলেন বাবুর ঘুম ভেঙেছে। চায়ে শেষ চুমুক, কাপ-প্লেট নিজেই ডাইনিং টেবিলে রাখতে গিয়ে ভাইপোর মুখোমুখি। নির্ঝর একবাটি মুড়ি হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে ডাইনিং টেবিলে, বলে, জেঠু, হেডলাইন কী আজকে?

আর হেডলাইন!

কেন?

অসভ্য লোকে ছেয়ে যাচ্ছে দেশটা!

কী হল আবার?

গুজরাটে দাঙ্গা থামেনি এখনও, নতুন এলাকায় শুরু হয়েছে, ওদিকে আমাদের এখানে ২১ নম্বর ওয়ার্ডের খবর শুনেছিস?

হ্যাঁ, শুনেছি। হবেই তো। তোমরা ধর্মেও থাকবে আবার জিরাফেও থাকবে—

ঘুম থেকে উঠেই শুরু করে দিলি!

মুড়ি চিবোতে চিবোতে মুচকি হাসে নির্ঝর, কেন ভুল বললাম?

ভুল নয় শুধু, অপ্রাসঙ্গিক!

অপ্রাসঙ্গিক! পৈতে রাখবে আবার মার্কসবাদীও হবে! বাপ-মা মরলে মাথা কামিয়ে ঘটা করে শ্রাদ্ধও করবে—

পৈতে? আমি?

তুমি নও, কায়স্থের আর পৈতে কোথায়? তোমার দলের লোকজনদের কথা বলছি আর তা ছাড়া—

আমি কোনো দল করি না, কোনোদিন করিনি।

তুমি ঘরে, শ্রীচৈতন্যের ছবি টাঙিয়ে—

দিনদিন বড়ো মূর্খ হয়ে যাচ্ছিস! অলস মস্তিষ্ক—

যুক্তিতে হেরে এখন—

কীসের যুক্তি? দাঙ্গার সঙ্গে চৈতন্যদেবের ছবির কী সম্পর্ক? ধর্মের কী সম্পর্ক?

ধর্ম পরিচয়েই দাঙ্গা করে মানুষ!

ভুল! দাঙ্গা যারা করে তাদের কোনো ধর্ম নেই!

আচ্ছা জেঠু, মানুষের যদি এই হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান—এই পরিচয়গুলো না থাকত, তাহলে কি—

ভুল! তখন অন্য কোনো পরিচয়ে দাঙ্গা হত, ভাষার নামে অঞ্চলের পরিচয়ে—

ওর কথা ছাড়ুন তো দাদা, সকাল ন'টায় ঘুম থেকে উঠে বড়ো বড়ো কথা—এরপর উনি টো টো করতে বেরুবেন। রান্নাঘর থেকে চায়ের কাপ নিয়ে নির্ঝরের সামনে রাখতে রাখতে মল্লিকা চিৎকার করে ওঠেন।

চুপ করে যায় দুজনেই। মল্লিকা গজগজ করেন, কাল রাতেও বারোটায় বাড়ি ফিরেছে।

কমলেশ ঘরে যেতে গিয়েও থমকে যান, নির্ঝরের দিকে ফিরে বলেন, এত রাত পর্যন্ত করিস কী? মায়ের কথা ভাবিস না!

ঠিক আছে, আজ থেকে মাকে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে না, গ্রিলের দরজায় তালা দিয়ে চাবি নিয়ে বেরোব—বলেই নির্ঝর তার জেঠুর ঘরে ঢুকে খবরের কাগজের একটা পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

রান্নাঘর থেকে কাজের মেয়ে শেফালি, উঁকি মেরে বলে, মাসিমা, বেগুনভাজা হবে তো?

মল্লিকা ঘাড় নেড়ে সাড়া দেন, তারপর আপন মনে, কিন্তু একটু গলা তুলে বলে চলেন যাতে কমলেশের কানে যায়—জেঠুর আদরেই আজ এত বাড়াবাড়ি। গোল্লায় দিল জীবনটা, ছোটো থাকতে কতবার বলেছি একটু কড়া শাসন করুন দাদা, আমি চোখ বুজলে যে কী হবে!—বলতে বলতে শেষ দিকে গলা ধরে আসছিল মল্লিকার।

নির্ঝরের বাবা সমরেশ যখন মারা গিয়েছিলেন তখন নির্ঝরের বয়েস সাত। সুজনডাঙা বয়েজ স্কুলে পড়াতেন, পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ হলের মধ্যেই সেরিব্রাল অ্যাটাক, হাসপাতালে নিতে নিতেই শেষ। কমলেশ তখন পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছেন, বিয়ে করেননি, সমরেশের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বিয়ে করবেন কি করবেন না এরকম

ধন্দে ভুগছিলেন, কিন্তু একমাত্র ভাইয়ের অকালমৃত্যুর পর আর নতুন সংসার পাতেননি। জ্যাঠা হলেও প্রকৃতপক্ষে কমলেশই যেন নির্ঝরের বাবা, বাবার স্মৃতি তেমন কিছু মনে নেই নির্ঝরের। সময়েশের মৃত্যুর পর ওই স্কুলেই ক্লার্কের চাকরি পান মল্লিকা, তবে কয়েক বছর আগে শিক্ষিকা হয়েই অবসর নিয়েছেন।

মল্লিকার গঞ্জনা কানে গিয়েছিল কমলেশের, এ গঞ্জনায় চুপ করে থাকা ছাড়া তাঁর উপায় কী? তিনি জানেন মল্লিকা ঠিকই বলছে। আসলে একমাত্র ভাইপোকে বাবার অভাব বুঝতে না দেওয়ার পণ করে তিনি হয়তো সত্যিই মাত্রাতিরিক্ত আদর দিয়েছেন। ছোটোবেলায় নির্ঝরের যে কোনো আবদার যেভাবেই হোক রাখতেন, মল্লিকা কোনো ব্যাপারে একটু কড়া শাসন করলে উল্টে তিনি বকা লাগাতেন মল্লিকাকে। কিন্তু ছেলেটার চল্লিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, বাউণ্ডুলে ভবঘুরে জীবন, কাজকর্মের ঠিক নেই, মাঝখানে নেশা-টেশাও করত, ইদানীং সে সব ছেড়ে দিয়েছে বলে শুনেছিলেন—কিন্তু এত রাত পর্যন্ত বাইরে কী করে? বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে কমলেশের, আজেবাজে কোনো মেয়েছেলের পাল্লায়—ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, বরং স্বাভাবিকই বলা যায়। তাঁর আর মল্লিকার যা জমানো টাকা-পয়সা আছে তা দিয়ে আজকের বাজারে—বাড়িটা করা আছে এই.যা রক্ষে। কিন্তু এভাবে কী চলে? সত্যিই তো দুজনে চোখ বুজলে ছেলেটার গতি কী হবে!

নির্ঝর দাঁড়িয়েই খবরের কাগজ দেখছিল, চেয়ারটা জানলার আরও কাছে টেনে নিয়ে কাগজ পড়ে নির্ঝর। লুঙ্গি ছেড়ে পাজামা পরেন কমলেশ, সুতির ফতুয়া চাপান গায়ে, দেওয়ালে ঝোলানো বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় ফাঁকা হয়ে আসা চুলে চিরুনি চালান।

জীবনের অর্ধেক কাটিয়ে দিলি, এভাবেই চলবে? এখনও সময় আছে—

অর্ধেক কেন? অর্ধেকের অনেক বেশিও হতে পারে, সময় অনেক আগেই চলে গেছে জেঠু!

দ্যাখ, আমরা চোখ বোজার আগে অন্তত রোজগারপাতি—মানে একটা ব্যবসা-ট্যাবসা—

ওসব আমার দ্বারা হবে না, তুমি ভালোই জান, রোজগার? আবার প্রুফ-রিডারের কাজ করছি।

মায়ের কথা ভেবেছিস একবার? মরেও শান্তি পাবে না, একমাত্র ছেলে তুই!

দেখ জেঠু, কত লোক প্রুফ-রিডার হয়ে বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করছে, আর আমি তো একা! তা ছাড়া আরও অনেক কাজই তো জানি, ইচ্ছে হলে—

আর কতদিন একা থাকবি? :কেন?

এই বয়েসে ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানে অনেক রোজগার করে—তারপর বিয়ে—কী যে বল!

শোন, আমার আর তোর মায়ের পেনশন আছে, টাকা-পয়সাও কিছু আছে, বাড়ি আছে, দরকার হলে দু-কাঠা জমিও পেছন দিক থেকে বেচে দেওয়া যাবে। তুই মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব, একটা ব্যবসা শুরু কর। বিয়ে রোজগারের জন্য আটকাবে না।

ধুর! আমি কি তাই বললাম? বোধ হয় এই নিয়ে একশো না পাঁচশো বার তুমি একই কথা বললে—

দরকার হলে আরও পাঁচশোবার বলব, যতদিন বাঁচব বলে যাব, চল্লিশ বছর আজকের দিনে সব শেষ হয়ে যাওয়ার বয়েস নয় রে—ইচ্ছে করলে নতুন করে জীবন শুরু করা যায়!

যার নয়ে হয় না তার নব্বুইতেও হয় না!

লাইফ বিগিনস্ অ্যাট ফরটি!

জেঠু! তুমি কিন্তু পাগলামি শুরু করেছ!

নয় তুই পাগল হবি নয় আমি—তোর বাবা নেই বলে কি তুই—মল্লিকার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না! ওপরে গিয়ে তোর বাবার কাছে আমি কী কৈফিয়ত দেব?

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে খাটের ওপর রেখে নির্ঝর বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। আপন মনে মাথা নাড়েন কমলেশ।

রাস্তা থেকে হাঁক ভেসে আসে—শিল-ই-ই-ল কাটাবেন?

## সাত

হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ/চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥

কীর্তন শুনতে পাচ্ছিলেন কমলেশ। কত্ত বহুদূর থেকে সমবেত কণ্ঠের সে সুরে কথায় আধো ঘুমের ভেতরেই কি একটু নড়ে উঠলেন? শুনতে পাচ্ছিলেন কি বৈরাগীর হৃদয় নিংড়ানো গান—খামাখা গৌরাঙ্গ মোরে রাখ রাঙ্গা পায়।

নবদ্বীপ শান্তিপুর ভেসে যাচ্ছে ভক্তিরসে—কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে/সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম নাহি জানে/শাস্ত্রের না জানে মর্ম অধ্যাপনা করে/গর্দভের প্রায় যে শাস্ত্র বহি মরে। বিশাল শোভাযাত্রা নিয়ে নগর কীর্তনে বেরিয়েছেন নিমাই সন্ন্যাসী, সে কৃষ্ণপ্রেমে জাত বিচার নেই কোনো। চণ্ডাল, মুসলমান, ব্রাহ্মণ—ভক্ত হতে পারে যে কেউ—কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার। কী হবে শুষ্ক জ্ঞানচর্চায়, যে জ্ঞানচর্চা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, এক মানুষকে আরেক মানুষের পায়ের তলায় রাখে, কী হবে

সেই পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রব্যাখ্যায় অধ্যাপনায় টীকাভাষ্যে যা মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা আনে—জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই/কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোঁসাই।

কারা তোমরা হিন্দুত্বের কথা বল? কে হিন্দু? হিন্দুত্ব কী? অনুচ্চারিত কথাগুলো এভাবেই জমছিল কমলেশের বুকের ভেতর আধো ঘুমের আচ্ছন্নতায়।

অরণ্যচারী আদিম মানুষের ভয়, বিস্ময়, বিশ্বাস—তা ঘিরে আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কার, পূজা, মন্ত্র—একদিন এই ভারতভূমিতে এই বাংলায় এ ভাবেই সারা পৃথিবীর মতো মানুষ তার ধর্ম তৈরি করেছিল। ভারতের জনজীবনে মিলেমিশে গেছে আদিবাসী অনার্য ধর্ম সাধনার সঙ্গে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনা, চড়কপুজো কালীপূজোর সঙ্গে মিশেছে যজ্ঞ, মন্ত্র। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণও যেমন আছে তেমনই আছে কলা-বউয়ের পুজো—হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে সমন্বয়, আর্য-অনার্যে সে সমন্বয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে, ধর্মেও। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মতে পথে শাখায় বহমান সনাতন ধর্ম, যা অনেক পরে চিহ্নিত হয়েছে হিন্দু ধর্ম নামে, তা তো আসলে আর্য-অনার্য ধর্মসাধনার সমন্বিত রূপ, জন্মান্তরবাদ কোথা থেকে পেল হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ? সে তো এসেছে ওই প্রাগার্য আদিবাসী ধর্মচিন্তা থেকেই—নিজের ভেতরে এসব কথা উচ্চারণ করতে পারেন কমলেশ।

আমি ভারতীয়, আমি বাঙালি, আমি হিন্দু—আমার হিন্দুত্বে আমার ভারতীয়ত্বে আমি সমন্বয় সাধনার উত্তরাধিকার বহন করছি। আমার বাঙালি সত্তার আদিতে রয়েছে অনার্য আদি-অস্ট্রেলীয়, দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর জীবনধারা, যে জীবনধারায় মিশেছে আর্যভাষী অ্যালপো-দিনারীয় আর মিশ্র নর্ডিক মন, সমন্বয়ই আমার উত্তরাধিকার। আজ এই বাংলায় কোটি কোটি বাঙালির ধর্মাচরণে যে হিন্দুত্ব তার কতটুকু বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ্যমত? সে ধর্মমতে ধর্মাচরণে ছড়িয়ে রয়েছে আর্য-অনার্য মিলিত সাধনা। নানা মতের পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম—বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, রয়েছে অবৈদিক কিন্তু আর্যধর্ম জৈন আজীবিক ও বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব, বজ্রযান, সহজযান, নাথপন্থা অবধূত মার্গ, সহজিয়া ভক্তিবাদ, কাপালিক মার্গ. লোকায়ত কত দেবদেবী ধর্মাচার—আরও কত মত কত পথ! কোটি কোটি হিন্দুর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য ঐতিহাসিক মহাপুরুষ বা ধর্মগুরু নেই, বহুমত বহুস্বর। আমার হিন্দুত্ব বহুস্বরিক, সে হিন্দুত্ব সমন্বয়ের কথা বলে, কোনো একরৈখিক অনুশাসন মানে না। কমলেশের হৃদয়ের গভীর থেকে বৃষ্টিধারার মতো শব্দের স্রোত ঝরে পড়তে চাইছিল।

কী দরকার হিন্দু হওয়ার? মানব হওয়াটাই কি যথেষ্ট নয়?—কে? কে বলল? তন্দ্রার ভেতরেই অস্থির বোধ করেন কমলেশ। যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান কোনো কিছু না হয়ে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে চান, থাকুন, সেটা তাঁর মত, সে মতে অশ্রদ্ধার কোনো কারণ নেই। কিন্তু কেউ যদি হিন্দু বা মুসলমান হয়েও মানুষ হতে চান, তাতেই বা আপত্তি কী? এভাবেই আজও পৃথিবীতে বেঁচে আছেন কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষ, হ্যাঁ মানুষ।

ধর্ম একদিনে সৃষ্টি হয়নি, হঠাৎ নেমে আসেনি আকাশ থেকে, সভ্যতা বিবর্তনের সঙ্গে জীববনধারার পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে ধর্মচেতনা। সভ্যতা এগিয়েছে, অরণ্যচারী মানুষ পশুপালন থেকে কৃষিকর্মে এসেছে, কৃষিকর্ম থেকে আরও এগিয়ে গড়ে তুলেছে নগরসভ্যতা, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছে, হারিয়ে যাওয়া 'মানব'-কে ফিরে পেতে চেয়েছে, ধর্ম হয়েছে তার আত্মচেতনা।

শোন নিরু, যিনি বলেছেন ধর্ম জনগণের আফিম তিনিই বলেছেন ধর্ম হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা। ধর্ম যেমন যুগ যুগ ধরে শাসকশ্রেণীর শাসন শোষণ নিপীড়নের অস্ত্র হয়েছে, সব দেশে সব ধর্মে দুর্বলকে পীড়নের অস্ত্র হয়েছে তেমনি ধর্মকে অবলম্বন করেই নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস প্রতিবাদের বিদ্রোহের ভাষা পেয়েছে—গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, কবীর, লালন, মজনু শা এঁদের মতো মানুষের নেতৃত্বে। ধর্ম খারাপ, রাজনীতি খারাপ—এসব বলে স্বার্থপর একটা জীবনের ভেতর ঢুকে পড়া খুব সোজা কাজ কিন্তু তাতে কি মানুষের ধর্ম পালন হল? যা চলছে তাকে মেনে না নিয়ে তাকে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়াই প্রকৃত মানুষের কাজ। একসময় পৃথিবীতে ধর্মের মঞ্চ থেকেই মানুষের ভালো করার চেষ্টা হয়েছে, এখন হয়তো সেই জায়গা নিয়েছে রাজনীতি। রাজনীতির মঞ্চকেও শোষণের জন্য যেমন ব্যবহার করা হচ্ছে আবার সেই রাজনীতিই হয়ে উঠছে—অত্যাচারিত মানুষের প্রতিবাদের ভাষা। কিন্তু আমি মনে করি মানুষের ভালোর জন্য ধর্মের প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি।

ঘোরের ভেতরে ভাইপোকে এইসব বলতে বলতে হাঁফ ধরে আসে কমলেশের, আর দেখতে পান নবদ্বীপের পথ ধরে চলেছেন নিমাই সন্ন্যাসী। 'জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী'—এক বিপ্লবী সন্ন্যাসী, পর্বতের গুহায় গিয়ে তপস্যা করেননি, মানুষের মধ্যে থেকেছেন, প্রেমের কথা বলেছেন, ভক্তির কথা বলেছেন 'আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী'। মানব জীবনকে নিতান্ত মায়া ভাবেননি, মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন, জাতের বিচার মানেননি, তাঁর ধর্মচিন্তা মানুষকে ভাগ করেনি, মিলিত করতে চেয়েছে।

কিন্তু কী হল এত প্রেমের ভক্তির কথা বলে, সাম্যের জয়গান গেয়ে? সমাজ পাল্টালো কি? শোষিত হতভাগ্য মানুষ কি স্বাধিকার ফিরে পেল? নির্ঝরের এসব প্রশ্ন শুনতে পান কমলেশ। ঘোরের ভেতরে কি এসব প্রশ্নে একটু অস্থির হয়ে ওঠেন, অস্থির হয়েও কি আবার শান্ত হয়ে যান? বহু মত থাকবে, বহু স্বর থাকবে, প্রশ্ন থাকবে, এভাবেই পথ হেঁটে যায়, যাবে মানুষ, মানুষের মৃত্যু হলেও যে মানব থেকে যায়, সে মানবের মনে এ ভাবেই যুগ যুগ ধরে জেগে থাকবে অসংখ্য প্রশ্ন।

কিন্তু সেদিনের জীবন সেদিনের প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে, বিস্তীর্ণ এক সামন্ততান্ত্রিক ভারত। ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতিভেদের দুঃসহ পীড়ন, রক্ষণশীল ইসলামের শরিয়তি বাঁধনের চেষ্টা, চরম শোষণ নির্যাতনে প্রহরী হিসাবে ভেদ নেই পুরোহিত আর মোল্লায়, ভারতের

নানা প্রান্তে তখনই এলেন কবীর, রবিদাস। বাংলায় সেদিন স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ঘোষণা করছেন—দুটি বর্ণ থাকবে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার থাকবে না, শূদ্রের ধর্ম হবে ব্রাহ্মণের সেবা! স্ত্রীলোকমাত্রেই শূদ্র, কোনো অধিকার নেই তাদের, পতিব্রতা হওয়ার একমাত্র ধর্ম তাদের। অন্যদিকে শাসনতন্ত্রে সুলতানী স্বৈরাচার, স্মার্ত হিন্দুয়ানির সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই সুলতানী শাসনতন্ত্রের, অত্যাচারী গাজী আর হিন্দু আমলা—তখন সাম্যের উদারতার বাণী নিয়ে এলেন চৈতন্য! চৈতন্যের সহজিয়া ভক্তিভাবনায় বাংলার বদ্ধ প্রাণহীন মৃতপ্রায় সমাজে প্রাণ এল, নিপীড়িতের দীর্ঘশ্বাস ভাষা পেল। কয়েকশো বছর আগের বাংলায় সে কি কম কথা নিরু!

ঘরে নিমাই সন্ন্যাসীর ছবি রাখব না তো কার ছবি রাখব? নিমাই সন্ন্যাসীর প্রেমধর্ম সাম্যধর্মের সঙ্গে কী সম্পর্ক দাঙ্গার বল নিরু, কী সম্পর্ক সাম্প্রদায়িক হানাহানির?

শুধু নিরুই বা কেন, অনেকেই তো বলে এমন কথা, কিন্তু মানুষে মানুষে হানাহানি কি শুধু ধর্ম নিয়ে হয়? দেশ নিয়ে হয় না? ভাষা নিয়ে হয় না? রাজনীতির রং নিয়ে হয় না? চামড়ার রং নিয়ে হয় না? আসল কথা তো নিরু শোষণ, আধিপত্য, ক্ষমতা—বালিশ থেকে মাথা সরে যায়, বিছানার ধারে মশারির গায়ে হেলে পড়েন কমলেশ।

আমার হিন্দুত্বের সঙ্গে মানবধর্মের কোনো বিরোধ নেই। আমাকে হিন্দুত্ব শিখিয়েছেন নিমাই সন্ন্যাসী। তিনি শিখিয়েছেন—তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা/অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। সেই হিন্দুত্ব ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষকে ঘৃণা করতে বলে না, বলে না কোনো উপাসনাস্থল ধ্বংস করতে কিংবা ভিন্ন মতের মানুষকে পুড়িয়ে মারতে।

জেঠু, তুমি কি নরম হিন্দুত্বের কথা বলছ?

ঘোরের মধ্যেই প্রশ্ন শুনে ডাইনে বাঁয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ান কমলেশ, মনে হয় চারিদিকে বৃষ্টি ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ছে কৃষ্ণনাম, নগর সংকীর্তনে বেরিয়েছেন গৌরাঙ্গ।

হিন্দুত্বের নরম-গরম কী রে? আমার মনে নিমাই আছেন, খৃষ্টও আছেন. আছেন তথাগত, বুকের ভেতর মহম্মদও আছেন, আছেন কৃষ্ণ। হাজার হাজার বছরের সমন্বিত ধর্মচিন্তার ফসল আমার হিন্দুত্ব, তা যেমন শিখেছি নিমাই সন্ন্যাসীর কাছে, শিখেছি সুফী সাধনা থেকে, সুফী সাধনাও তো এক সমন্বয়, কী ভেদ উপনিষদের ব্রহ্মাত্মা'র সঙ্গে সুফী সাধনার আল-হক-এর?

তুমি সমন্বয়ের কথা বলছ, কিন্তু বিরোধ-বিভেদ কি ইতিহাসের বাইরে? হিন্দু বনাম বৌদ্ধ কিংবা মুসলমান বনাম হিন্দু? হিন্দু রাজারা অত্যাচার করেছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ওপর, আবার মুসলমান শাসকদের জিজিয়া কর—এসব কী তা হলে?

বিভেদ ছিল, কিন্তু বিরোধ বিভেদ থেকে সমন্বয়ের শক্তি অনেক বড়ো বলেই ভারতীয়

সভ্যতা টিকে আছে, ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস নিয়েও একে অপরকে প্রভাবিত করে—

ধর্মের জন্য দেশ টুকরো হল, আজও চলছে মারামারি বিদ্বেষ, সমন্বয়ের শক্তি বড়ো বলছ?

ধর্মের জন্যে দেশ টুকরো হয়নি, ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে, আসল কারণ অর্থনীতি-রাজনীতি-ক্ষমতালিপ্সা, ধর্মের জন্যেই যদি টুকরো হবে দেশ তা হলে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হল কেন? আর সমন্বয়ের শক্তি বড়ো এই জন্যে যে দাঙ্গা বিরোধ সত্ত্বেও অনেক বেশি মানুষ পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস করেছে, বিভেদ শক্তি সর্বত্র সমান ভাবে মাথা তুলতে পারেনি—

তুমি তো বলছ বিভেদের জন্য ধর্ম নয় দায়ী রাজনীতি, অর্থনীতি, তা হলে সমন্বয়ের শক্তিতে এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন?

অসুস্থ রাজনীতি যদি ধর্মকে বিভেদের কাজে লাগায় তবে সুস্থ রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মকে সমন্বয়ের ভ্রাতৃত্বের ঐক্যের কাজে লাগাবে না কেন?

তার জন্যে মানবধর্মই তো যথেষ্ট, হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান এই আলাদা আলাদা বিভাজনের দরকার কী? আলাদা আলাদা নামে গোড়াতেই বিভেদ তৈরি করে—বিভেদের মূল উপড়ে মানবধর্মের কথাই বলা ভালো নয় কি?

প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসী একজন হিন্দু বা মুসলমানের সঙ্গে মানবধর্মের কোনো বিরোধ নেই, তা ছাড়া—

কোন্‌টা প্রকৃত ধর্ম বল তো জেঠু?

ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ক্রিয়াকাণ্ডের গণ্ডি ছাড়িয়ে তার যে মূল ভাবটুকু, তার যে নির্যাস—

কিন্তু কোটি কোটি মানুষ ওই আচার-অনুষ্ঠানকে অন্ধভাবে সম্পূর্ণ বশ্যতার সঙ্গে অনুসরণ করাকেই ধর্ম ভাবে, মূল ভাবের কথা ভাবে আর কজন—

সেটা মানুষের স্বভাবের প্রকৃতির দুর্বলতা, ধর্মের নয়, দেখ্ নিরু, তুই যে মানবধর্মের কথা বলছিস, পৃথিবীতে সমাজের প্রয়োজনেই যখন কেউ নতুনভাবে মানবধর্মের কথা বলছেন—তখনই নতুন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে, এভাবেই বুদ্ধদেব হজরত মহম্মদ—

কিন্তু ধর্মগুরুদের প্রচারিত মানবধর্মের মূল ভাবটুকু কজন গ্রহণ করতে পেরেছে, তাদের অবর্তমানে তার কত রকমের ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা—তখন কতগুলো প্রাণহীন কথামালা মানুষ যন্ত্রের মতো প্রশ্নহীন আনুগত্যে—

ধর্ম কেন? পৃথিবীর যে কোনো দর্শন, মতবাদ সম্পর্কেই এটা সত্যি—ধর আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আলোচিত সমালোচিত চর্চিত যে মতবাদ—সেই মার্কসবাদের কত রকমের ব্যাখ্যা, কত আলাদা আলাদা মার্কসবাদী দল গোষ্ঠী, তাদের মধ্যেও কত পারস্পরিক বিদ্বেষ হানাহানি—আসলে যে বা যারা কোনো কিছু ব্যাখ্যা করে, সেটা তাদের

বুদ্ধি, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান, তাদের স্বার্থ, মনুষ্যত্ব, অভিজ্ঞতা, দেশকাল সেই অনুযায়ীই তো করে—আর সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ যখন মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে নানা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাঁরা কি সবাই মূল মার্কসীয় দর্শন তত্ত্ব বুঝতে পেরেছেন?

ধর্ম হোক মার্কসবাদ হোক— আমার মনে হয় কোনো বাদেরই দরকার নেই, সব বাদ-ই বাদ দেওয়া ভালো!

তুমি তা মনে করতেই পার, যত মত তত পথ, কিন্তু তুমি যা বললে তাও একটা মতবাদ—হতে পারে তা নৈরাজ্যবাদ অথবা সংশয়বাদ কিংবা নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থবাদ!

নির্ঝর কী যেন বলছিল তারপর, স্পষ্ট শুনতে পান না কমলেশ, পাশ ফিরে মশারির ধার থেকে সরে এসে তাঁর মনে হয় পাতলা মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে সারা ঘর, সে মেঘ থেকে একটু পরেই বৃষ্টি নামবে।

মেঘের ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে নির্ঝর, তবু সে যেন কী বলছে, শুনতে পান না, না কি সে আরও কিছু শুনতে চাইছে জেঠুর কাছ থেকে, বুকের ভেতর কত কথা জমে আছে তার, কত ভাবনা, জমে জমে বরফ হয়ে আছে, সে বরফখণ্ড কি গলে যেতে চাইছে?

যুগে যুগে কত মানুষ মিশেছে ভারতীয় জনপ্রবাহে, সঙ্গে নিয়ে এসেছে নতুনতর চিন্তা, সংস্কৃতি। এভাবে একদিন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষজনও এসেছে, প্রবাহে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা, শুরু হয়েছে সমন্বয়ের আরেক অধ্যায়। ভারতভূমিতে বহু মানুষ দীক্ষিত হয়েছে নবীন সেই ধর্মে, শাসন ক্ষমতার সুবাদে হয়তো কিছু মানুষ সুযোগ-সুবিধার আশায় কিংবা কোথাও কোথাও জোর-জুলুমে বাধ্য হয়েছে কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি মানুষ ব্রাহ্মণবাদী বর্ণব্যবস্থায় নিষ্পেষিত দলিত বিপুল মানুষ সাম্যের আশায় ইসলামকে গ্রহণ করেছে, স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা মনে পড়ে যায়—কখনও যদি কোনো ধর্মের লোক দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলামী ধর্মের লোকেরাই আসিয়াছে। বিবেকানন্দও সমন্বয়ের কথা ভাবতেন, বলেছেন আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই, বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামী দেহ একমাত্র আশা। এ দেশে 'দীন-ই-ইলাহি' জন্ম হয়েছে, দারা শিকোহ বাহান্নটি উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন ফারসী ভাষায়, নিজহামুদ্দিন আউলিয়া বা মইনুদ্দিন চিস্তির মতো সন্ন্যাসীরাও প্রচার করেছেন সহিষ্ণুতা আর সমন্বয়ের কথা, ভারতের মাটিতে ইসলামও পেয়েছে নতুন অবয়ব। অর্জন করেছে নতুন বৈশিষ্ট্য—নিরু, এসব নিয়েই আমার হিন্দুত্ব। জানিস, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান তিন পদ্ধতিই উপাসনা করেছিলেন—আমার হিন্দুত্বের শিক্ষক এঁরাই, দাঙ্গার সঙ্গে এ হিন্দুত্বের সম্পর্ক কী রে?

পাখির ডাক, আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে, আলো ফুটবে একটু পরেই, কমলেশ অনুভব করেন বুকের বরফগলা জলের ফোঁটা যেন একটু একটু করে মুছে নিচ্ছে অন্ধকার।

অন্ধকার মুছে নেমে আসেন নিমাই সন্ন্যাসী, গম্ভীর তত্ত্বের জাল ছিঁড়ে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন এক প্রেমিক মানুষ, সৃষ্টি করেছেন এক জাগরণ, জেগে উঠছে বদ্ধ জলায় থমকে থাকা বাংলার সমাজ, বৈষ্ণব আন্দোলনে নিচুতলার মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। প্রসার ঘটছে সাক্ষরতার, ভেঙে যাচ্ছে জাতবিচারের গণ্ডি, নগর ছেড়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে জাগ্রত চেতনা, জঙ্গল কেটে বাড়ছে কৃষিক্ষেত্র, সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে বাংলা ভাষা ও বাংলা কবিতা, বৈষ্ণব গান বাঁধছেন বহু মুসলমান কবিও, ভেঙে যাচ্ছে ধর্মীয় গোঁড়ামির দেওয়াল, স্মৃতির বিধান ঠেলে এগিয়ে আসছেন মহিলারা, স্ত্রী-গুরুরূপে বিখ্যাত হচ্ছেন জাহ্নবীদেবী, সীতাদেবী, হরিপ্রিয়া ঠাকুরানি।

নিরু, কত বছর আগের সেই বর্ণ শাসনের নিষ্ঠুর গোঁড়া চরম রক্ষণশীল সমাজের কথা ভাব—সেই সমাজে উদারতার জাগরণ নিয়ে এলেন এক প্রেমিক বিপ্লবী পুরুষ, ধর্মবিশ্বাসের সূত্রেই সে ভাবনা পৌঁছে গেল নিচুতলায়। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের একটি অংশ হিসেবেই বিষ্ণু উপাসনার ঐতিহ্য ছিল এদেশে, ছিল ভাগবত পুরাণের ভক্তিরত্নাবলীর শ্লোক, ছিল নারদভক্তি সূত্র, ছিল বৈষ্ণব গান ও কবিতা—সেই ভক্তির মত ঐতিহ্যকে এক সামাজিক জাগরণে পরিণত করলেন চৈতন্যদেব, সরল সহজ ভাষায় নামকীর্তনের মাধ্যমে তিনি ছড়িয়ে দিলেন সাম্য উদারতার কথা। পরে সে মত একেবারে নিচুতলায় নিয়ে যান খ্যাত-অখ্যাত সহজিয়া সাধকেরা, গোঁসাই-রা, সে মতের প্রভাবে জন্ম নিল মানবপ্রেমিক ও প্রতিবাদী বাউল-ফকিরের দল—মুচি, মুদ্দাফরাস থেকে বারবনিতা, সমাজের চূড়ান্ত অবহেলিত মানুষগুলো হৃদয়হীন জগতের হৃদয়ের মতোই আঁকড়ে ধরেছিল নিমাই সন্ন্যাসীর ভক্তিমত।

নিরু, আমরা গদগদ হয়ে উনিশ শতকের কথা বলি, উনিশ শতকের নবজাগরণের কতটুকু পৌঁছেছিল নিচুতলায়? অনেক ভুলত্রুটি সত্ত্বেও বাংলার প্রকৃত নবজাগরণের কথা উঠলে নিমাই সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে ভক্তি আন্দোলনের কথাই বলতে হবে। অহিংস আন্দোলন বা সত্যাগ্রহের নজির নিমাই সন্ন্যাসীই বোধহয় এদেশে তো বটেই সারা পৃথিবীতেই প্রথম সৃষ্টি করেন—তোদের কার্লমার্কসও চৈতন্যকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, জানিস কি তা?

জানলা দিয়ে একটুকরো ফর্সা আকাশ দেখতে পেলেন কমলেশ, বিছানা থেকে উঠে পুবমুখো জানলার সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে মাথায় ঠেকালেন, বিড়বিড় করেন, প্রণাম শ্রীচৈতন্য, প্রণাম গৌরাঙ্গ নিমাই সন্ন্যাসী।

## আট

ওষুধ কিনে আপন মনে গজগজ করতে করতে ফিরছিল নির্ঝর। সন্ধেবেলায় রিক্সা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছেন মল্লিকা, খবর পেয়েই অতীন ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল নির্ঝর।

মল্লিকা সাধারণত ডাক্তারের কাছে যেতে চান না, মায়ের স্বভাব জানা আছে নির্ঝরের অথচ পরে বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে। অতীন ডাক্তার চেম্বার ছেড়ে আসতে চাইছিলেন না, একঘণ্টা বসে থেকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এসেছে। এক্স-রে করিয়ে নিতে বলে ওষুধ লিখে দিলেন। কাল সকালে হাসপাতালে এক্স-রে করিয়ে নেবে ঠিক করেছে নির্ঝর, মল্লিকা অবশ্য বলছেন না, না, ডাক্তাররা ওরকম বলে, এমন কিছু হয়নি আমার। ডান পায়ের গোড়ালি থেকে উপর দিকটা ফুলেছে, কাটেনি কোথাও। মল্লিকা বলছেন, একটু চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

স্টেশন থেকে 'বসুভিলা'য় আসতে মেইন রোড ছেড়ে বাঁয়ে ফিরে ঘোযপাড়া রোড, এখন নতুন নাম হয়েছে রবীন্দ্র সরণি, সে রাস্তার যাচ্ছেতাই অবস্থা, বছরের পর বছর একই অবস্থা। সারাই হয়, কদিন যেতে না যেতেই হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে যে কে সেই! সারা রাস্তায় ছোটো-বড়ো অসংখ্য গর্ত। রিক্সার চাকা বোধহয় কোনো গর্তে পড়েছিল, কাত হয়ে পড়ে অ্যাক্সিডেন্ট। তবু অল্পের ওপর দিয়ে গেছে, ব্যস্ত এই রাস্তায় অটো, মিনিবাস, সবই তো চলে! যেভাবে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন পেছন থেকে চলন্ত বাস অটো পিষে দিতে পারত!

হইহই করে ছুটে এসেছিল পথচলতি লোকজন, দোকানদারেরা দুর্গা সুইটসে মল্লিকাকে বসিয়ে পায়ে বরফ ঘষে দিয়েছিল। রিক্সাওয়ালাও চড়-চাপড় খেয়েছে, কারণ এই সন্ধেবেলাতেই তার মুখে ভুরভুর করছিল মদের গন্ধ।

নির্ঝর জানে মাতাল না হলেও যে কোনো রিক্সা-অটোয় যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, রাস্তার যা হাল! সুজনডাঙার নাকি উন্নতি হচ্ছে! হ্যাঁ, এই বুঝি নমুনা উন্নতির! আপনমনে গজরাতে গজরাতে ওষুধ হাতে ফিরতি পথে বাড়ির কাছাকাছি এসে নির্ঝর সামনে পেল বিপুলকে।

এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মানব, তারই একনিষ্ঠ চেলা বিপুল, গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠতেই নির্ঝরের মুখোমুখি।

কী ব্যাপার তোমাদের? পেয়েছ কী তোমরা আমাদের? নির্ঝরের চড়া গলায় একটু যেন অপ্রস্তুত বোধ করে বিপুল। বিপুল দত্ত, বছর আঠাশ-উনত্রিশ, টুকটাক ব্যবসা করে, প্রকৃতপক্ষে সেই দেখাশোনা করে ওয়ার্ডের কাজ।

কী হল নিরুদা?

রাস্তার কী হাল করে রেখেছ? ভোটের সময় খুব তো লম্বা গলা!

কোন্ রাস্তার কথা বলছে নির্ঝর বুঝে নিতে দেরি হয় না বিপুলের, হেসে বলে, আবার সারাই করতে হবে, দিন কয়েকের মধ্যেই—

এই তো কদিন আগেই সারালে!

না, বেশ কয়েক মাস হয়ে গেছে।

বাজে বোকো না, আমার মনে আছে।

না, দাদা, আপনি ভুল করছেন।

আচ্ছা বেশ, তা কয়েক মাসই না হয় হল, এত ইমপর্ট্যান্ট একটা রাস্তা, কয়েক মাসেই এ হাল হবে কেন?

চুপ করে থাকে বিপুল।

কনট্রাকটরের সঙ্গে কি তোমাদের—

কথা শেষ করে না নির্ঝর। আবার হাঁটতে শুরু করে, চুপ করে পাশে পাশে বিপুলও হেঁটে আসে কয়েক পা। তারপর হাত ধরে টেনে দাঁড় করায় নির্ঝরকে, বলে আপনি রাগ করেছেন, সেটা স্বাভাবিক, আপনি তো জানেন মানবদাই সব নন, রাস্তা দেখাশোনা করার জন্যে ওয়ার্ড কমিটি আছে—

তুমিও তো ওয়ার্ড কমিটির এক মাতব্বর!

নিশ্চয়! কমলেশ দাদুও তো আছেন ওয়ার্ড কমিটিতে।

জেঠুর কথা ছাড়, উনি কোথায় নেই বল তো?

আসলে কী জানেন রাস্তাটা খুব সরু—

তাতে কী হল?

সরু মানে পিচের পর কাঁচামাটির অংশ খুব কম, পাশের ড্রেনও পাকা নয়। তাই পিচের তলার মাটিতে জল চুঁইয়ে ঢুকে রাস্তা নষ্ট করে দেয়।

আবার হাঁটতে থাকে নির্ঝর, পাশাপাশি হাঁটে বিপুলও। বিপুল বলতে থাকে, আসলে এটা এমন একটা সমস্যা—পাকা ড্রেন না হওয়া পর্যন্ত কাউন্সিলার হোক, ওয়ার্ড কমিটি হোক, চেয়ারম্যানই হোক, কেউ কিছু করতে পারবে না।

ঘন ঘন রাস্তা ভেঙেচুরে যাওয়ার যে যুক্তি দেয় বিপুল তার সামনে ঠিক কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু যুক্তিটা মন থেকে মানতেও পারে না নির্ঝর।

হাতের ওষুধের দিকে এতক্ষণে চোখ পড়ে বিপুলের, মল্লিকার অ্যাক্সিডেন্টের কথা জানতে পেরে, নির্ঝরের সঙ্গে ঢুকে পড়ে বাড়িতে। মল্লিকার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে বেরিয়ে যায়।

মল্লিকা বলেন, ছেলেটা কিন্তু ভালো।

নির্ঝর বলে, খারাপ বলছি না, আজকাল রাজনীতিই বল আর সোস্যাল ওয়ার্কই বল এসব নিঃস্বার্থভাবে করার লোক কোথায়! ছেলেটা আর যাই-হোক ধান্দাবাজ বলে মনে হয় না। কিন্তু রাস্তা খারাপ হওয়ার যা ব্যাখ্যা দিল—

কী বলল?

যা বলল তাতে মনে হল কনট্রাক্টরের শেখানো বুলি কপচে গেল!

প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ দুটো কখন কটা করে খেতে হবে মাকে বুঝিয়ে দেয় নির্ঝর। তারপর মলম আলতো ভাবে লাগিয়ে দেয় চোটের জায়গায়। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে বাইরে বেরুনোর উদ্যোগ করতেই মল্লিকা বলেন, আবার কি এখন না বেরুলে চলছে না?

জেঠুকে খবর দিতে যাচ্ছি।

খবর দিয়েই বুঝি ফিরবি তুই!

দরজা থেকে ফিরে এসে তালা চাবির খোঁজ করে নির্ঝর, ফ্রিজের পাশে সিমেন্টের তাক থেকে তুলে নেয়, বলে, গ্রিলে তালা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার আর উঠতে হবে না।

নিরু?

হুঁ।

বসবি একটু।

কী হল আবার?

মায়ের পাশে একটুও বসতে ইচ্ছে করে না তোর?

মুখ থেকে বিরক্তির ছায়া মুছে ফেলে একটু হাসে নির্ঝর, খাটের কোনায় বসে, বলে, ইচ্ছে করে কিন্তু এক কথা ঘ্যানঘ্যান করে বললে উঠে যেতে ইচ্ছে করে।

লম্বা করে পা মেলে বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে ছিলেন মল্লিকা।

ঘ্যানঘ্যান! এ বয়েসে আর কী করব বল?

কেন? তুমি তো গান শুনতে ভালোবাস, গান শোন, বই পড়, টিভি দেখো, আচ্ছা অরুণা মাসির সঙ্গে কদিন বেড়িয়ে আসতে পারতে। ওরা এত করে বলল।

তুই নিয়ে গেলে যেতাম, তোদের ছেড়ে একা বেড়াতে যাব!

তোমার ছোটো রেডিওটা কই?

এই তো, ব্যাটারি বদলাতে হবে। সন্ধেয় কিনে আনব ভেবেছিলাম, তা আর হল কই?

আচ্ছা, চারটে পেনসিল ব্যাটারি তো? আমি এনে দিচ্ছি। নির্ঝর উঠে দাঁড়ায়।

বোস চুপ করে, শুধু গান শুনে আমার মন ভালো থাকবে, মায়ের মনের এটুকুই খবর রাখিস তুই!

তুমি আবার সেই রেকর্ড বাজাবে বুঝতে পারছি, তোমার বউমা, নাতি-নাতনি, ওসব হবে না, শুধু শুধু ওসব ভেবে লাভ কী?

কী ভাবব তা হলে? মরার কথা? মরেও শান্তি পাব না যে! বলতে বলতে গলা ভারি হয়ে আসে মল্লিকার।

কথা ঘোরাতে নির্ঝর বলে, শেফালিকে বলেছ তো রাতে থাকতে?

না, থাকার দরকার নেই, কাজ সেরে দশটা নাগাদ চলে যাবে, ভোরে চলে আসবে আবার।

শোন মা, জেঠুকে খবর দিই, রাগ করবে না হলে।

পালাতে চাইছিস?

আচ্ছা, খবর দিয়েই চলে আসব, কথা দিচ্ছি।

কোথায় পাবি তোর জেঠুকে?

দেখি কোথায়—বোধহয় সবুজ সংঘে আছে, সামনে ওদের সিলভার জুবিলি।

ভাইপো বাউণ্ডুলে ভাবুক, আর জ্যাঠা সমাজসেবী! ভালোই আছিস তোরা!

নির্ঝর শব্দহীন হাসি ছড়িয়ে বেরিয়ে যায়।

মল্লিকা শেফালিকে ডাক দিয়ে আলুভাতের সঙ্গে একটু ঢেঁড়সভাতেও দিতে বলেন, চায়ের বাসন ধোয়া হয়নি সেটা মনে করিয়ে দেন।

গুমোটে ঘরের বাতাস কেমন যেন ভারি হয়ে আসছে এরকমই মনে হয় মল্লিকার। অল্প বয়েসে বিধবা হতে হল, তারপর একা একা এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে আর যেন বাঁচার কোনো স্বাদ নেই, ছেলের কথা ভেবে সবসময় মন হুহু করে। বিশেযত স্কুল থেকে রিটায়ারের পর আরও অসহ্য লাগে, আচ্ছা, নিরু কী এভাবেই কাটিয়ে দেবে সারাজীবন, কী করে কাটাবে?

আমি মরে গেলে কে দেবে ওকে ভাত-জল, বললেই নিরু হাসতে হাসতে বলে, এখন হোম-ডেলিভারি সিস্টেমের যুগ, ফোন করে বলে দিলে বাড়ি এসে ভাত-মাছের ঝোল রুটি-তরকারি যা চাও দিয়ে যাবে! এও হয়! ভাবতেই কেমন আশ্চর্য লাগে, ফোন ফ্রিজ টিভি সব মিলিয়ে কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগে। রিফুইজি ক্যাম্পে ছোটোবেলা কেটেছে, সুজনডাঙায় যখন বউ হয়ে আসি তখনও এখানে ইট-সিমেন্টের পাকা বাড়ি কটা হাতে গুণে বলা যেত, কাঁচা রাস্তা, তখনও কত ফাঁকা মাঠ, গাছগাছালি, সন্ধে হলে শেয়ালের ডাক!

শেফালি বলে, মাসিমা এফ-এম চালাও, একটু গান শুনি।

শুনতে পান না মল্লিকা, মন কোথায় যেন চলে গেছে।

## নয়

দেশবিভাগ মেনে নেওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি ছিল হিন্দু-মুসলমানের হানাহানি রক্তপাত বন্ধ হবে, লুপ্ত হবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব, কিন্তু তা কি হল?

দাদুমণির দিনলিপিতে এ প্রশ্নের তলায় তারিখ ও মাস পড়া যাচ্ছে না, সালটা বোঝা যাচ্ছে, উনিশশো চৌষট্টি। সুজনডাঙার আশেপাশে গ্রামগুলোতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়েছে, সে কথার উল্লেখ আছে দিনলিপিতে।

বিছানাময় ছড়ানো ছিটানো অনেকগুলো বই, নির্ঝরের দাদুমণি অমলেশের দিনলিপির খাতা, যে সব পত্রিকায় তাঁর কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি। গরমের দুপুরে ফ্যানের তলাতেও বগল ঘেমে যাচ্ছিল বারবার, অস্বস্তি হচ্ছিল, নির্ঝর পাশেই গামছা রেখে দিয়েছে, মুছে নিচ্ছিল।

যে প্রশ্ন দাদুমণি চৌষট্টি সালে লিখে রেখে গেছেন, আজকের ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশেও তা দগদগে ঘা-এর মতো ছড়িয়ে আছে। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, খুনোখুনি, ক্ষমতার চাবি খোঁজা—এ থেকে আজও বিরাম নেই এদেশে, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে।

অমলেশ দিনলিপি লিখতে শুরু করেছেন উনিশশো বাহান্ন থেকে, কিন্তু প্রতিদিন পরপর লিখে গেছেন তা নয়, বাহান্নর এপ্রিলে হয়তো পরপর কয়েকদিন লিখলেন—তাতে দেশ আছে, স্ত্রীর জ্বরের কথা আছে, সংসারের অভাবের কথা আছে, তারপর চার মাস আবার কিছু লেখেননি, তারপর হয়তো আবার পরপর দুদিন। এভাবে পঞ্চান্ন পর্যন্ত, আবার পাঁচ বছর কিছু নেই, ষাটের ছাব্বিশে জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে কয়েকদিন—এভাবেই পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত টুকরো টুকরো লেখা।

দিনলিপি আর নিবন্ধগুলো খুঁটিয়ে পড়ে নির্ঝরের মনে হয়, দেশবিভাগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বা সামগ্রিক রাজনীতি নিয়ে দাদুমণি এক এক সময় এক এক রকম ভেবেছেন, নানা পরস্পরবিরোধী চিন্তা। কিন্তু দুটো জিনিস—শরৎ বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি তার শ্রদ্ধা বিশ্বাস আর বঙ্গভঙ্গের বেদনা সবসময়েই তাকে ঘিরে রেখেছে। এখন ভাবলে হাসিই পায়, দাদুমণি বিশ্বাস করতেন নেতাজী ফিরে আসবেন কোনো এক পনেরোই অগস্টে, ভারতবাসীকে মুক্ত করবেন দুঃখ লাঞ্ছনা থেকে, দুই বাংলা জোড়া লাগবে।

হাসি পায় কেন? চোখ ফেটে জল আসে না কেন? একজন নেতার প্রতি দাদুমণির মতো কত কোটি কোটি মানুষের অগাধ বিশ্বাস, তাকে সামনে রেখে যে স্বপ্ন সে স্বপ্ন ছাড়া উদ্বাস্তু জীবনের কঠিন সংগ্রামে কী করে বাঁচবেন তাঁরা? আর সুভাষচন্দ্র বসুকেও তো অনেকটাই ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যতই অপূর্ণ হোক স্বাধীনতার স্বপ্ন, তবুও যে স্বাধীনতা পেয়েছে ভারতবাসী, নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ছাড়া সে কি পাওয়া

সম্ভব হত আদৌ? নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয় নির্ঝরের, হাসি পাবে কেন?

বাইরে রোদ্দুরের তাপে নুয়ে আছে গাছপালা, জ্বলছে কৃষ্ণচূড়া গাছটা, অবৃষ্টির ভেতর ওর ওই রঙের বৃষ্টি যেন চোখ-মন-মগজ সব কিছুকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

দাদুমণি কোনো সময় লিখছেন গভীর হতাশায়, দেশবিভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? হিন্দু আর মুসলমান দুটো জাতিই বটে! এদের আলাদা থাকাই ভালো! আবার কখনও বিভাজন ঠেকানো গেল না বলে হা-হুতাশ করছেন। গত রাত, আজ সারা সকাল হতে এই দুপুর পর্যন্ত খুঁটিয়ে সব পড়েছে নির্ঝর, সঙ্গে খানিকটা পড়েছে অন্য কিছু বই—পড়তে পড়তে সব কিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। মৃদু যন্ত্রণায় টিপটিপ করছে মাথা।

কাগজপত্র, খাতা, পত্রিকা একধারে সরিয়ে রেখে বালিশ ছাড়াই টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে নির্ঝর। কপালে আড়াআড়ি হাত দুটো ভাঁজ করে চোখ বোজে। ১ নম্বর উডবার্ণ পার্ক, শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ি, বাংলার কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ নেতাদের বৈঠক, সাতচল্লিশের উনিশে মে তারিখে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলা গঠনের প্রস্তাব নিয়ে চুক্তি, চুক্তিতে সই করলেন শরৎচন্দ্র বসু এবং আবুল হাসিম। চুক্তির কপি পাঠিয়ে চিঠি লিখলেন গান্ধীজীকে, চিঠি লিখলেন জিন্নাহকে। কিন্তু নেহরু, প্যাটেল এবং গান্ধীজী মানলেন না সেই চুক্তি। গান্ধীজী এক চিঠিতে শরৎ বসুকে বঙ্গভঙ্গের জন্য যে পরিবেশ রচিত হয়েছে তাতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না করতে উপদেশ দিলেন।

ইতিহাসের এক চাপা পড়া অধ্যায় যেন ছবির মতো ভেসে উঠছিল নির্ঝরের বন্ধ চোখের অন্ধকারে। চৌদ্দই জুন গান্ধীজীকে এক চিঠিতে শরৎ বসু জানালেন বঙ্গ-ভঙ্গের পক্ষে যে প্রচণ্ড উত্তেজনামূলক প্রচারাভিযান চলছে—এতদ্‌সত্ত্বেও আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই যে যদি গণভোট নেওয়া হত তা হলে বাংলার হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অধিক সংখ্যায় ভোট প্রদান করতেন।

পাতলা ঘুমের ভেতর বৃষ্টির শব্দ নাকি বৃষ্টির মতো ঝরে পড়া কান্নার শব্দ হাহাকারের শব্দ শুনতে পেল নির্ঝর। বৃষ্টিভেজা এক মানুষ এসে দাঁড়ালেন, রোগা, পাতলা ঢেউখেলানো চুল, মোটা কালো ফ্রেমের চশমা।

দাদুমণি!

হ্যাঁ বল।

ঠিক কবে ভাগ হয়ে গেল বাংলা?

কবে? সাতচল্লিশের বিশে জুন বাংলার আইনসভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পাশ হল, টুকরো হল ভারত! তার কিছুক্ষণ পরেই বাংলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের এম-এল-এরা সভা করলেন, বাংলা ভাগের পক্ষে মত দিয়ে হিন্দুপ্রধান বাংলাকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করার পাশ করালেন—টুকরো হয়ে গেল বাংলা।

প্রতিবাদ হল না?

প্রতিবাদ? হ্যাঁ, পরদিন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—'বঙ্গভঙ্গের মধ্যে দিয়ে আমাদের বিভাগ ও বিভেদের শেষ নয়, নূতন দুর্ভাগ্যের সূচনা মাত্র, লেখা হয়েছিল 'সারা কলিকাতা শহর আইনসভার দুয়ারে ভাঙিয়া পড়ে নাই কেন? গত চল্লিশ বছর ধরিয়া যাঁহারা স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যাঁহারা হাসিতে ফাঁসির মঞ্চে উঠিতেছিলেন... তাঁহারা আজ কোথায়? তাঁহাদের সেই বিপ্লবী অভ্যুত্থানে আইনসভার প্রাসাদভবন কাঁপিয়া ওঠে নাই কেন?'

আর?

একই দিনেই বাংলাভাগের বিপক্ষে তখনও স্বাধীন বাংলার পক্ষে মত দিয়ে বাংলাকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার ডাক দিয়েছিলেন বিশিষ্ট মুসলিম লেখক বুদ্ধিজীবীরা, যেমন আবু সয়ীদ আইয়ুব, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, শওকত ওসমান এরকম আরও অনেকে।

বারবার শুনছি—স্বাধীন বাংলা, তুমিও কি তাই চেয়েছিলে?

স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব অনেক পরের ব্যাপার, আমি বা আমার মতো ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ আমরা চেয়েছিলাম অখণ্ড স্বাধীন ভারত।

এটাই তো ছিল কংগ্রেসের দাবি!

হ্যাঁ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গোটা ভারতভূমি ভারত ও পাকিস্তান দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে—এ চাইনি আমরা।

কিন্তু কংগ্রেস তো মেনে নিল শেষ পর্যন্ত দেশ ভাগের প্রস্তাব?

ছেচল্লিশের মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, দেশ জুড়ে ভয়াবহ দাঙ্গা! তারপর মেনে নিল কংগ্রেস, নেতারা বললেন এছাড়া উপায় নেই।

মুসলিম লিগের দাবি মতো পুরো বাংলা পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল, তাই না?

হ্যাঁ, আর তখনই দুটো মত উঠে এল, একদল বললেন বাংলাকে ভাগ করে হিন্দুপ্রধান অংশকে আলাদা প্রদেশ হিসেবে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করা হোক, আর অন্য দিকে শরৎবাবু, কিরণবাবু, সুহরাওয়াদী, আবুল হালিমদের সঙ্গে একসঙ্গে বাংলা ভাগ ঠেকাতে স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রস্তাব তৈরি করলেন।

প্রথম দলের মতের স্বপক্ষে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়?

হ্যাঁ।

তুমি কখনও শ্রদ্ধা জানিয়েছ শরৎ বসুকে আবার কখনও শ্যামাপ্রসাদকে, অথচ—

ইতিহাসের এক জটিল অধ্যায়, আমরা অখণ্ড ভারত চেয়েছি, গান্ধীজী বেঁচে থাকতে ভারত ভাগ হবে, পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেওয়া হবে, ভাবতে পারিনি আমরা। এমনকি সাতচল্লিশের পরও দেশ ছাড়িনি, ভেবেছিলাম আর যেখানে যাই হোক, আমরা খুলনা জেলায় নিরাপদে শান্তিতে থাকব। যখন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান মেনে নেওয়া হচ্ছে, তখন স্বাধীনতার কয়েক মাস আগে পূর্ববঙ্গের হিন্দু বাঙালি অনেকে ভেবেছিল ভারতে যদি

স্বাধীন বাংলা হোক— আবার পূর্ববাংলা সহ বাংলার হিন্দুপ্রধান জেলাগুলির একটা বড়ো অংশের হিন্দু বাঙালি মুসলিম লীগ শাসনকালের তিক্ত অভিজ্ঞতায় চাকরি-বাকরি সর্বত্র হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যে, ছেচল্লিশের দাঙ্গার অভিজ্ঞতায় বঙ্গভঙ্গ মেনে নিতে চেয়েছিল, কারণ তারা ভাবত স্বাধীন বাংলাতেও সামান্য হলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, মুখ্যমন্ত্রী হবেন মুসলিম, মুখ্যমন্ত্রী সুরহাওয়ার্দীকে তারা দেখেছিল চোখের সামনে। সর্বত্র একটা অবিশ্বাসের হাওয়া, তারা হিন্দুপ্রধান ভারতের প্রদেশ হিসেবেই থাকতে চেয়েছিল।

তুমি কি চেয়েছিলে?

বললাম তো, পাকিস্তান চাইনি, স্বাধীন বাংলাও চাইনি, কংগ্রেসের যে দাবি ছিল অখণ্ড ভারত—তাই চেয়েছিলাম।

কংগ্রেস যদি দেশভাগ না মানত, তা হলে দেরি হলেও কি আসত অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা?

কী হলে কী হত কে জানে, তবে আমরা পূববঙ্গের বহু বাঙালি চেয়েছিলাম ভারত এক থাকুক।

আর শরৎবাবু?

শরৎবাবু দেশভাগের অবস্থায় দুই বাংলার সংখ্যালঘু মানুষের কথা ভেবেছিলেন, লীগের যে নেতারা তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীন বাংলার কথা বলেছিলেন, তাঁদেরকে পাকিস্তানপন্থীরা দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করছিলেন, শরৎ বসু, আবুল হাসিমরা বুঝেছিলেন ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ভাগ হয়ে দুই বাংলাতেই অসহায় অবস্থায় পড়বেন সংখ্যালঘু হিন্দু-মুসলিম বাঙালি। শরৎবাবুকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হয় আবার পুরো বাংলাই যেখানে পাকিস্তানে চলে যেত যেখানে শ্যামাপ্রসাদের লড়াই তার এক টুকরোকে অন্তত ভারতের সঙ্গে রাখতে পেরেছে—

পাকিস্তানে থাকতে যে ভয় তোমাদের ছিল, হিন্দুপ্রধান অখণ্ড ভারতে থাকতে সংখ্যালঘু মুসলমানদেরও কি সে ভয় ছিল না?

কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দল ছিল, অখণ্ড স্বাধীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শই গ্রহণ করা হত।

বিভক্ত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে সংখ্যালঘুরা কি নির্যাতিত হননি? পশ্চিম বাংলা থেকেও বহু মুসলমান চলে যেতে কি বাধ্য হননি, তাঁদের ভিটেমাটি ছেড়ে?

কী বলতে চাও?

বলতে চাই এই বিভাজনের জন্যে দায়ী কে? মুসলিম লীগ? কংগ্রেস? মুসলমানেরা? হিন্দুরা? ব্রিটিশ?

নির্ঝর দেখল এ প্রশ্নে তার দাদুমণি আস্তে আস্তে চশমা খুলে পাঞ্জাবির খুঁটে কাঁচ মুছে নিচ্ছেন, কপালে অল্প ভাঁজ, চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর খুব ধীরে নিচু

গলায় কী যেন বলছেন, ঠোঁট নড়ছে, উদাসী দৃষ্টি কোথায় যেন চলে গেছে—বহুদূর, কী বলছেন শোনার চেষ্টা করতে করতে পাখির কাকলি শুনতে পায় নির্ঝর, চোখ খোলে, বাতাস তেতে-পুড়ে আছে, জলতেষ্টা বোধ করে।

বিছানা থেকে উঠে খাটের তলায় রাখা মাটির কুঁজো থেকে কর্পূর মেশানো জল গ্লাসে ঢেলে পরপর দু'গ্লাস খেয়ে নেয়।

আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে গোড়া থেকেই হিন্দু ধর্মীয় ভাবাদর্শ সক্রিয় থেকেছে, কখনও তা যথেষ্ট রক্ষণশীল এবং হিন্দু পুনরুত্থানবাদী তাই নয়? কংগ্রেসে নানা মতের নানা ধারায় মানুষ যোগ দিয়েছেন, তার মধ্যে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরাও ছিলেন, ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর ভরসার কেন্দ্র হয়ে উঠতে এর ফলে বাধা পেয়েছে কংগ্রেস, বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে মহাসমারোহে গণপতি উৎসব কিংবা লালা লাজপত রায়ের হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে সভাপতিত্ব, গীতার ভাষ্যকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবাদর্শের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন কংগ্রেসের কেউ কেউ, শুধু কংগ্রেসই বা কেন? সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাসী বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীগুলোও কালীমূর্তির উপাসনা করতেন ; হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে আজীবন কাজ করে গেলেও গান্ধীজীর রাম-রাজত্বের ধ্বনি কিংবা গো-রক্ষার সমর্থন—এসবও কি স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনে হিন্দুত্বের ছায়া এনে দেয়নি? ওদিকে সৈয়দ আহমেদ খান, মহম্মদ আলি, মহম্মদ ইকবাল এঁদের নেতৃত্বে ইসলামী পুনরুত্থানবাদ, ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবাদ ও যার ফলে শেষপর্যন্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের বিস্তারে মুসলমানদের জন্যে আলাদা দেশের দাবি অখণ্ড ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রামকে দুর্বল করেছে, আর শাসক-শোষক সুলভ কূটকৌশল নিয়ে ব্রিটিশ এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাবে এ তো স্বাভাবিক—এইসব ভাবতে ভাবতেই বিছানায় টেবিলে চেয়ারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বইপত্র খাতা নাড়াচাড়া করে অস্থির নির্ঝর।

শরৎ বসুর স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব মানতে চাননি নেহরু, প্যাটেল, চুক্তি পরিকল্পনার খসড়া তাঁদের মনে হয়েছিল বর্ণহিন্দু আর তফসিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির একটা চেষ্টা চলছে, চক্রান্ত চলছে, শরৎবাবু অবশ্য চক্রান্তের ব্যাপারটাকে একদম উড়িয়ে দিয়েছিলেন—কী হবে এখন আর এইসব চাপাপড়া ইতিহাস খুঁড়ে এনে? কী হবে ঐ হা-হুতাশ করে যে ফজলুল হকের কে পি পি-র সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার হলে অন্য এক রাজনৈতিক পরিবেশে হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যেত বাংলা ভাগ? কিছুই কি হবে না? এ শিক্ষা তো নেওয়া যায় যে ধর্ম যেন না মেশে রাজনীতির সঙ্গে, ভারতের সর্বত্র এবং দুই বাংলায় ধর্মকে নির্বাসন দিতে হবে রাজনীতি থেকে—ধর্ম পরিচয়ে সংখ্যালঘু মানুষ তার সংখ্যালঘুতাকে দূরে সরিয়ে রেখে ভারতীয় হিসেবে বাঙালি হিসেবে জাতি-চেতনার মূল স্রোতে মর্যাদা নিয়ে সম্ভ্রম নিয়ে যাতে মিশে যেতে পারে সে দায়িত্ব বেশি করে নিতে হবেই ধর্মপরিচয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষকে, তাই না?

কিংবা জীবন থেকে ধর্ম পরিচয়টাকেই মুছে ফেলা ভালো, নয় কি? কিন্তু জেঠুর মতো কত মানুষ, বেশির ভাগই মানুষই তো তা মানতে চান না—নিজের ভেতর এসব ভাবনার কাটাকুটি নিয়ে ভারি অস্থির বোধ করে নির্ঝর।

সুজনডাঙা নিয়ে তার লেখাটা আর এগোয় না, সুজনডাঙার জন্মের ইতিহাসে রয়েছে উদ্বাস্তু সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যার পেছনে দেশভাগ, দেশভাগ থেকে ভাবনা গড়িয়ে যাবেই ধর্মীয় পরিচয়ের নিরিখে বাঙালির হানাহানির ইতিহাসে—সে ইতিহাসে এক প্রশ্নের সন্ধানে আরেক প্রশ্নের জন্ম দেয়, যেন এক জটিল গোলকধাঁধা!

জেঠু, মানছি তোমার হিন্দুত্বে বিভেদ সৃষ্টি করে না কিন্তু তা কি মানুষ পরিচয়টাকে একটা সংকীর্ণ গণ্ডির ভেতরে একটু হলেও বেঁধে দেয় না? হিন্দুত্বের যে ব্যাখ্যা তুমি দাও তা কি মেনে চলে হিন্দুধর্ম বিশ্বাসী কোটি কোটি মানুষ? জেঠু, তুমিই তো বলেছ যে আমাদের খুলনার বাড়িতে কোনো মুসলমান অতিথি চলে যাওয়ার পর উঠোন ধোয়া হত গোবরজল দিয়ে—সে মুসলমান কী করে একসঙ্গে হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুপ্রধান দেশে বাস করতে চাইবে?

আমি জানি, এই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছে তোমার মতো করে আছে, কিন্তু আমি কিছুতেই একমত হতে পারি না—যে ধর্মভেদে ভাগ হয়েছে ভারত, ভাগ হয়েছে বাংলা, অবিশ্বাস আর ঘৃণা আজও বয়ে চলেছে উপমহাদেশ জুড়ে, জেঠু সেই ধর্মকে আমি নির্বাসন দিতে চাই জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে—আমি আরও চিৎকার করে বলতে চাই আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই, খ্রিষ্টানও নই, আমি মানুষ, এই আমার পরিচয়।

নিজের ভেতরে এইসব উচ্চারণ করতে করতেই নির্ঝর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে চলে আসে কমলেশের ঘরের দরজায়। খাটে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন কমলেশ। নির্ঝর ঘরে ঢুকতেই কাগজ সরিয়ে কমলেশ বললেন, কাগজটা নিবি? বোস একটু, হয়ে গেছে আমার।

দাদুমণিকে দেখলাম।

দা-দু—ও, কাল রাতে?

না, এই দুপুরে, একটু ঝিমুনি এসেছিল, মনে হল দাদুমণি যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পড়েছিস বাবার লেখাগুলো? ডায়েরি?

জেঠু, কমিউনিস্ট পার্টি বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে শরৎবাবু-আবুল হাসিমদের উদ্যোগে সমর্থন করেছিল, না?

কমলেশ কাগজ সরিয়ে ভাইপোকে দেখলেন আরেকবার, মৃদু হাসলেন, কাগজ ভাঁজ করে উঠে বসলেন, খাটের একপাশে হাত দেখিয়ে বললেন, সেসব অনেক কথা, বোস এখেনে।

অধিকারী রিপোর্টের কথা শুনেছিস?

শুনেছি, কিন্তু ঠিক পরিষ্কার ভাবে—

কমিউনিস্ট নেতা গঙ্গাধর অধিকারীর রিপোর্ট বা প্রস্তাবের ওপর আলাপ-আলোচনা করেই ওর পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে স্বাধীন ভারত হোক স্বশাসিত রাজ্যগুলোর স্বেচ্ছামূলক একটা ফেডারেশন বা ইউনিয়ন। রাজ্যগুলো থেকে রাজস্থানি, গুজরাটি, অসমিয়া বা বাঙালি এইরকম জাতিসত্তার ভিত্তিতে, ব্রিটিশ শাসনের বা ট্যাক্স আদায়ের সুবিধার জন্য ইচ্ছেমতো প্রদেশ বানিয়েছে সেটা না মেনে রাজ্যগুলো হোক বিভিন্ন জাতিসত্তাভিত্তিক এবং সেইসব রাজ্যগুলো স্বশাসিত তো বটেই, স্বাধীনও, কারণ ইচ্ছে করলে তাদের ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারও থাকবে।

বিচ্ছিন্নতার অধিকার?

হ্যাঁ, তাঁরা মনে করেছিলেন ভারতবর্ষ একটি বহুজাতিক দেশ, সুতরাং জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনেই তাঁরা ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন আর কোনো জাতির ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী অংশ যারা কোনো অঞ্চলে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন পশ্চিম পঞ্জাব বা অবিভক্ত বাংলার পূর্ব ও উত্তরের জেলাগুলিতে তাদের ক্ষেত্রেও স্বশাসিত বা স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি করেছিলেন।

তার মানে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিজাতিত্ব মেনেছিল?

না, ঠিক তা বলা যায় না, দ্বিজাতিতত্ত্বে গোটা ভারতবর্ষকে হিন্দু আর মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছিল, ওঁরা তো তা চাননি, বাঙালি ওড়িয়া এইরকম নানা জাতির স্বতন্ত্রতাভিত্তিক বহুজাতিক ভারত ইউনিয়ন চেয়েছিলেন, বিচ্ছিন্নতার অধিকার থাকলেও ওঁরা মনে করতেন জাতিরাষ্ট্রগুলি তাদের নিজের স্বার্থেই ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

সোভিয়েত মডেল?

হাসলেন কমলেশ, মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, সোভিয়েত মডেল, এদেশে বামপন্থীরা কমিউনিস্টরা গোড়ার থেকেই সোভিয়েত মডেল চীন মডেল এইসব মডেল ফলো করতে গিয়ে নিজেরা আর মডেল—

বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার থাকলে আজ হয়তো টুকরো টুকরো হয়ে যেত সারা দেশ!

কী জানি হয়তো তাই, তবে আমার মনে হয় এই ঐক্যবদ্ধ ভারতে রাজ্যগুলোর হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দিয়েই বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের অগ্রগতি সম্ভব, এত বড়ো দেশে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে খুব বেশি কেন্দ্রীভূত শাসনের ফল ভালো হতে পারে না—ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলে—

ফোন বাজে, কথা থামিয়ে হাত বাড়িয়ে খাটের ধারে টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোন তুলে সাড়া দেন কমলেশ।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় নির্ঝর, অবৃষ্টির খরতাপে পুড়ে যাচ্ছে শেষ দুপুর।

## দশ

তোমার লেখাটা কতদূর?

অ্যাঁ?

ভাবনা ভেঙে নির্ঝরের চমকে ওঠার এই মুহূর্ত ভারি মিষ্টি লাগে সুরমার। মনে হয়, উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো এই বাউণ্ডুলে পুরুষটি সবসময় কী এক অন্বেষণে সর্বদাই ডুবে আছে। সে অন্বেষণ পুরুষটিকে আশ্চর্য এক রহস্য দিয়েছে, গভীরতা দিয়েছে।

কী ভাবছ? এত চুপচাপ?

না, ওই আর কি—

লেখাটা এগোল?

না, সেভাবে আর এগোল কই, জানো তো আমি সবকিছুই শুরু করি, শেষ করি না!

কিছু কি শেষ হয়?

হয় না বুঝি? তা হলে বোধহয় শুরুও হয় না—বলতে বলতে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাইতোলা আড়াল করে নির্ঝর।

নির্ঝরের সঙ্গ পেয়ে আজ সন্ধেয় মন বেশ খুশিতে ভরে উঠেছে সুরমার। বৃষ্টিমাখা বাতাসে সন্ধেটা একটু শীতল হতে চাইছিল, সারাদিন যা প্যাচপেচে গরম! বুবুনের টিউটরকে চা দিয়ে এসে গা ধুতে যাচ্ছিল, তখনই নির্ঝর এল। নির্ঝরকে বসিয়ে গা ধুয়ে এসে হালকা নীল ম্যাক্সি পরে ঘাড়ে গলায় পাউডার দিয়ে কপালে ছোট্ট টিপ পরে নিয়েছিল, নীল টিপ। টিপ পরা ছেড়েই দিয়েছে প্রায়, আজ হঠাৎ ইচ্ছা হল অনেকদিন পর, হঠাৎ? নাকি অনেকদিন আগে নির্ঝর তার কপালে নীল টিপ দেখে, বা বেশ দেখাচ্ছে—বলেছিল বলেই—না এমনটা সে যে খুব ভেবেচিন্তে করেছে তা নয়, আসলে বিষণ্নতা দূরে সরাতে চাইছিল সে, নির্ঝরকে পেয়ে যে একঝলক খুশির হাওয়ায় বিষণ্নতা খানিকটা পিছু হঠেছিল, সেই মুডটাই সাজপোশাকে সব কিছুতেই অনেকক্ষণের জন্যে ধরে রাখতে চাইছিল—নিজেকে এমন কথাই শোনাতে পারে সুরমা।

কী এক বিষণ্নতা সবসময় ছেয়ে থাকে তার সারা আকাশ, একঘেয়ে প্রায় নিঃসঙ্গ জীবনের ভার ক্রমশ যেন অসহ্য হয়ে উঠছে, আশেপাশে এ-বাড়ি ও-বাড়ি মহিলা মহলে মিশতে গিয়েও সুরে মেলেনি তাল কেটে গেছে, সব আড্ডা আলাপই যেন সেখানে বড্ড ছোট্ট একটা গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরে, স্বামী শাশুড়ি কি ছেলের পড়াশোনা বা খাওয়া না-খাওয়ার সাতকাহন ভালো লাগে না সুরমার। হাওয়া বাড়ছে, পশ্চিমের জানলা দিয়ে বৃষ্টিমাখা বাতাস ঘরের ভেতর অনেকদূর পর্যন্ত ছুটে আসছে। জানলা বন্ধ করে সোফায় মুখোমুখি বসতেই নির্ঝর বলে, শিলচরে শেষ কবে গিয়েছিলে?

সে অনেক বছর—একাশিতে বাবার সঙ্গে, তারপর আর যাওয়া হয়নি। কেন হঠাৎ—

কাছাড়ের ভাষা আন্দোলনের কথা মনে পড়ে তোমার?

মনে পড়ে মানে বাবার কাছে শুনেছি, আমার জন্ম তো একষট্টিতে—

নির্ঝরের ঝিরঝির হাসি দেখে অবাক হয় সুরমা, ভ্রূ একটু উপরে তুলে বলে, এতে হাসির কী হল?

মেয়েদের বয়েস নাকি জানা যায় না?

ওসব পুরুষদের বানিয়ে তোলা কথা। কলপ লাগিয়ে গোঁফ কামিয়ে বয়েস কমাতে চাওয়া পুরুষের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তেমন কোনো কচি সুন্দরীর সামনে পড়লে তুমিও হয়তো দু-চার বছর কমিয়ে বলবে!

প্রাণখোলা হা-হা হাসি হাসতে পারে নির্ঝর, অনেকদিন পর।

বয়েস জানতে এত কৌশলের দরকার কী ছিল, সোজাসুজি জানতে চাইলেই বলে দিতাম।

না-না, বয়েস-টয়েস নয়, আসলে আমার লেখাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে নানারকম প্রসঙ্গ চলে আসছে, দেশভাগ বাংলা বাঙালি, তাই—

কথা শেষ করে না নির্ঝর। বাইরে বৃষ্টি কি বাড়ল? হাওয়ার দাপট বোঝা যায়।

বরাক উপত্যকার বাঙালিদের কি বাঙালি বলে ভাব তোমরা?

মানে?

তোমরা একুশে ফেব্রুয়ারি পালন কর, হয়তো হুজুগ, তবুও কিছু মানুষ দিনটিকে শ্রদ্ধায়—কিন্তু উনিশে মে-র কথা জানেই না কেউ!

সুরমার কথায় সুরে চাপ চাপ অভিমান জড়িয়ে আছে, খানিক থেমে সে নিচু স্বরে বলে, অসমের বাইরে আমার জীবনে তুমিই প্রথম মানুষ যে উনিশে মে-র কথা তুললে।

সুরমার এই সংলাপের পেছনে যেন অনেক ঢেউ ছিল, অনেক শব্দ, অনেক চাপাপড়া কথা, অনেক দীর্ঘশ্বাস হাহাকার!

কমলা ভট্টাচার্য-র নাম শুনেছ?

না, উনিশে মে-র কথা আমি কিছুই সেভাবে জানি না, দাদুমণির ডায়েরি পড়তে পড়তে বিষয়টা নজরে এল—তুমি বল, আমি শুনব।

সুরমা নদীর নাম শুনেছো?

সামনে দেখছি।

সামনে? এ নদী কোথায়, এ তো মজে যাওয়া পুকুর!

থাক, তোমার সুরমা নদীর কথাই বল।

আমার বাবা-ঠাকুর্দা সবাই সিলেটের মানুষ, সিলেট সুরমা উপত্যকা বিদেশ হয়ে গেল সাতচল্লিশের পর। ছাপ্পান্ন, সাতান্ন পর্যন্ত চেষ্টা করেও থাকতে না পেরে আমাদের

পরিবারের সকলে চলে এলেন করিমগঞ্জে, পরে শিলচরে। খুব কষ্টে সংসার চলত তখন, জেঠু আর বাবার উপরেই সংসারের দায়দায়িত্ব, কাকারা বেকার। আমি দশ বছর বয়েস পর্যন্ত শিলচরে ছিলাম, একাত্তর থেকে কলকাতায়।

কপালের উপর নুয়ে আসা চুলের সরু গোছাটাকে সরিয়ে নিতে নিতে আনমনা হয়ে যায় সুরমা, নির্ঝর বলে, কমলা ভট্টাচার্যর কথা কী যেন বলছিলে?

অ্যাঁ, হ্যাঁ, একষট্টির উনিশে মে উনিও শহিদ হয়ে ছিলেন, শিলচব স্টেশনে সেদিন গুলি চলেছিল। বাংলায় আর কোনো মহিলা ভাষা-শহিদ আছেন কি? অথচ তোমরা তার নামও জানো না!

সুরমাকে যেন আজ একটু অন্যরকম মনে হচ্ছিল নির্ঝরের, যে কাঠিন্য জড়িয়ে থাকে সুরমার শরীরের ভাষায় ভঙ্গিতে, মুখের কথায়---সে সব ভেঙেচুরে কেমন এক রুদ্ধ আবেগের ঝোরা পথ পেতে চাইছিল।

একষট্টির উনিশে মে, রবীন্দ্রপক্ষ চলছে, দেশজুড়ে কত আড়ম্বরে ধুমধাম করে পালন করা হচ্ছে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ আর সেদিনই সেই ভাষারই এগারো জন তাঁদের নিজের দেশে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায়—, কেউ মনে রেখেছে কি তাঁদের? তোমরা পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা, তোমাদের এই উদাসীনতা নিয়ে বাবাকে কত কষ্ট পেতে দেখেছি। সেদিন ভোর থেকে বাবাও ছিলেন ধর্মঘটে রেল অবরোধে, লাঠির ঘায়ে হাত ভেঙে গিয়েছিল, সেই অবস্থাতেই টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তুলেছিল পুলিশ—

গলা একটু ভারি হয়ে আসে সুরমার, সোফায় টানটান শরীরটা হঠাৎ যেন সজোরে হেলে যায় পেছনে। সমর সেনের পঙ্‌ক্তিগুলো মনে পড়ে নির্ঝরের---সে চোখে নেই নীলার আভাস, নেই সমুদ্রের গভীরতা/শুধু কীসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, কঠিন ইশারা/কীসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে---একমনে সুরমাকে দেখতে দেখতে মাথা নাড়ে সে, চোখের হাহাকার ক্ষুধার্ত দীপ্তি যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কোনো গভীর সমুদ্রতল থেকে উঠে আসছে, শুধু হিংস্র হাহাকারই নয় নীলার আভাসও আছে, কঠিন ইশারাই শুধু নয় গোপন মমতাও আছে।

কী হল, কী দেখছ?

নির্ঝর ঠোঁটে শব্দহীন হাসি ঝুলিয়ে বুকপকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। সুরমা সোফা ছেড়ে উঠে টেবিলে ছাইদানি এনে রাখে। প্যাকেট থেকে সিগারেটের বদলে বিড়ি বের করতেই সুরমা হাতের ইশারায় থামতে বলে নির্ঝরকে, দেওয়াল আলমারি হাতড়ে সিগারেটের একটা প্যাকেট ছুঁড়ে দেয় টেবিলে, বলে, রাখো তোমার কাছে।

এ দেখছি খুব দামী ব্র্যান্ড, এ পোষায় না আমার, বড্ড হালকা, ধোঁয়ার মজাটাই পাওয়া যায় না—বলতে বলতে অবশ্য প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নেয়, ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আজকাল খাচ্ছ না কি এক-আধটা?

খাব ভাবছি।

স্মার্ট ইনটেলেকচুয়াল মহিলা হবে?

বাঃ মহিলাদের স্মার্ট ইনটেলেকচুয়াল হওয়ার এত শর্টকাট পথ আছে জানা ছিল না, তোমরা বিড়ি সিগারেট গাঁজাখোর পুরুষেরা বুঝি সবাই খুব ইনটেলেকচুয়াল?

শব্দহীন অথচ বিস্তৃত হাসি আর অনেকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতে দিতে নির্ঝর বলে, তোমার ঘরে পড়ে থাকার কথা নয় সুরমা, শুধুমাত্র ঘর সংসারের চৌহদ্দিটা তোমার পক্ষে খুব ছোট্টো জায়গা।

বটে! বাইরে যাব? কোথায়? কী কাজে? সুজনডাঙার পুরো বাহির জুড়ে বসে আছে পুরুষেরা। আর তাদের চোখে সব ছেড়ে আমি একজন মহিলা, শুধুই মহিলা!

তুমি আবার লেখালেখি শুরু করবে বলেছিলে।

হ্যাঁ, বলছিলাম কিন্তু—

কিন্তু কী?

কষ্ট করে লিখব যে ছাপবে কে?

ছাপার কথা পরে, আগে শুরু কর।

পারি না, ভাবি পারব আসলে পারি না, কবিতা বল গল্প বল—দু-এক লাইনের বেশি এগোয় না! একটানা দশ-বারো বছর এক লাইন লিখিনি আমি, এখন আর—আসলে খুব ফুরিয়ে গেছি আমি, হাড়-মজ্জা-মন সব শুকিয়ে—

উনিশ মে নিয়ে একটা লেখা তৈরি করতে পার তো—তোমার শিলচরের স্মৃতি, তোমার বাবার কথা, ভাষা আন্দোলনের কথা—এই সব নিয়ে বেশ গুছিয়ে।

এসব কেউ পড়বে?

খুব বেশি কেউ হয়তো পড়বে না, তবু দু-চার জন নিশ্চয় পড়বে।

কী লাভ ওই দু-চারজনের জন্যে লিখে?

লেখার আগে এসব ভাবলে আর লেখা যায় না, অবশ্য আমারও ওই একটা রোগ, কোনো কাজ শুরু করার আগে বা শুরু করে কেবল আবোল-তাবোল ভাবনা। জীবনের এত বছর কেবল ভাবতে ভাবতেই কেমন বিশ্রী ছন্নছাড়া কাটিয়ে দিলাম আমি! কোনো কাজ শুরু করতে না করতেই কোথা থেকে যেন একরাশ হতাশা আমায় ছেয়ে ফেলে, হতাশা নাকি আলস্য? আর সেই হতাশা বা আলস্যের পক্ষে নানারকম যুক্তি খাড়া করে ফেলি আমি! সব বোধহয় খুব হাতে গরম, একেবারে তাৎক্ষণিক পেতে চাই আমি!

তোমার দাদাও এই অভাগীর ইহকাল পরকাল মান্যবর প্রশান্তবাবুর মতো খুব হিসেবী, কাজের লোক হলে ভালো হত বলছ?

যে যেভাবে বাঁচতে চায়—তবু আমি ঠিক ওরকম কাজের কথা বলছি না, একটা

কাজ যার মধ্যে আমার আনন্দ আছে, সৃষ্টিমগ্নতা আছে, ভেতরের তাগিদ আছে, কিছু গড়ে তোলার একটা—

সিগারেটে পরপর দ্রুত কয়েকটা টান মেরে ছাইদানিতে গুঁজে দেয় নির্ঝর, বলে, পৃথিবী মানুষ সংসার সব পুরোপুরি বুঝে নিয়ে কাজ শুরু করা যায় নাকি? পুরোপুরি বোঝা যায় নাকি? কে বোঝে জীবনের রহস্য? বোঝার চেষ্টাতেই জীবন কেটে যায়। চল্লিশ বছর ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল আমার, কাজ করা হল না! দাদুমণি যে ডায়েরি লিখে রেখে গিয়েছিলেন, কে পড়েছে তা? জেঠু হয়তো পড়েছে, তারপর এত বছর পর আমি পড়ছি, দাদুমণির কিছু বলার ছিল। কিছু কথা জমেছিল, হয়তো তিনি তাঁর প্রতিদিনকে যেভাবে চিহ্নিত করতে চাইছিলেন তারই একটা রেকর্ড রেখে যেতে চেয়েছিলেন, কেউ কোনোদিন পড়বে কি পড়বে না এসব নিয়ে ভাবেননি দাদুমণি, সে ভাবেও তো লেখা যায়। তুমি নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে একঘেয়েমি কাটিয়ে জীবনের একটা মানে বা একটা কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাইছ তো? তোমার লেখা তোমাকে সেই সুযোগ সেই বৈচিত্র্য এনে দিতে পারে। ছাপা হবে কি না, কেউ পড়বে কি না—এসব চিন্তা গৌণ করে রাখাই ভালো, নাকি?

তুমি আমাকে বলছ নাকি নিজেকে বলছ? তোমার সৃজনডাঙা নিয়ে লেখাটা এগোবার একটা মোটিভ ফোর্স, কিছু যুক্তি খাড়া করতে চাইছ, কী মশাই, ঠিক না?

যে কোনো কথাই এক অর্থে মানুষ নিজেকেই বলে—জানো দাদুমণির নানা লেখা, চিঠিপত্র, ডায়েরি এসব পড়তে পড়তে বারবার মনে হচ্ছে —একটা সময়ের ইতিহাস, একটা রক্তমাংসের মানুষের যন্ত্রণা উপলব্ধি, ডায়েরিতে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখের পাশাপাশি দাদুমণি ব্যাখ্যা করেছেন, মন্তব্য করেছেন—এত বছর পরে সেগুলো পড়তে গিয়ে এমন একটা অনুভব, ভারি ইন্টারেস্টিং! জানো, উনিশে মে-র কথাও লিখেছেন উনি!

তাই?

উনিশে মে-র ঘটনা নিয়ে আন্দোলনকারীদের সমর্থনে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হরতাল হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতা ময়দানে চব্বিশে মে প্রতিবাদ সভা হয়েছিল—এ সব লিখেছেন দাদুমণি। প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, হীরেন মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত বসু, ত্রিদিব চৌধুরী আরও অনেকে। প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। সৃজনডাঙাতেও প্রতিবাদ সভা হয়েছিল, সে সভায় ছিলেন দাদুমণি, এ সব লিখে গেছেন।

আর আজ? দু'হাজার দুই-এর বাংলায়? কে মনে রেখেছে উনিশে মে?

আজ? বাংলা ভাষাই ভুলতে বসেছি আর উনিশ! বাংলার ইতিহাস, তার অতীত গৌরব, আমাদের যেন নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির আগে কোনো ইতিহাসই নেই! ধর, পাল বংশের সময়টা, বাঙালি যেন জানেই না!

বুবুন দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলে, মা, স্যার ডাকছেন।

সুরমা নির্ঝরের দিকে তাকিয়ে বলে, বসো একটু, একবারে চা নিয়ে আসছি।

নির্ঝর সোফা ছেড়ে উঠে পশ্চিম দিকের জানলা খোলে, বৃষ্টি কমেছে, মেঘ ডাকছে, এক ঝলক হাওয়া।

অন্ধকারে বৃষ্টির ভেতর নাকি বৃষ্টির অন্ধকারের ভেতর নেমে পড়তে লুটোপুটি খেতে খুব ইচ্ছে হয় নির্ঝরের।

## এগারো

ভোলা কি উড়ে গেল চাঁদে? তার হাত দুটো কি ডানা হল?

নিখোঁজ ভোলার কথা ভাবতে ভাবতেই সেই রাতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল নির্ঝরের, যে রাতে ভোলা জিজ্ঞেস করেছিল চাঁদ কতদূরে বস্?

মাসির চায়ের দোকান-কাম-হোটেলে শিকঘেরা জানলার ধারে টুলের ওপর বসে ছিল নির্ঝর। জানলার ওধারে পচা ডোবা, তার ওধারে তিনতলা বাড়ি। খুচরো ডোবায় দু-তিনটি শুয়োর লুটোপুটি খাচ্ছিল। উল্টোদিকে বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে ছিল জিতু আর জমিদার, হুড়মুড়িয়ে ঢোকে শ্যাম। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কুণ্ডলী পাকানো গামছা দিয়ে মাথা, ঘাড়, হাত মুছতে থাকে, বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি। সন্ধেবেলায় বৃষ্টি এড়াতে দোকানের মুখে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কয়েকজন, আরও দু-চারজন ভেতরে বেঞ্চিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, চায়ের অর্ডার পরপর।

বাস কনডাক্টর জিতু হাত দুটো মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভেঙে এক ঝটকায় উরুর ওপর নামিয়ে এনে বলে, যাই বলিস, লংরুটে ডিউটি করার মজাই আলাদা!

ছাড়লে কেন তা'লে? বলতে বলতে হাই তোলে শ্যাম, ভেজা জামা খুলে হাতে নিয়ে বেঞ্চির ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে।

ছাড়লাম কি আর সাধে? মালিকটা খাস-খচ্চর! ডিউটি অফ করলে এইসান খিস্তি মারত, তখন আমার পেট ছাড়ছে—প্রায়ই ডিউটি অফ হয়ে যেত।

ভোলার কথা ভাবতে ভাবতেই এসব কথার কিছু কিছু কানে আসছিল নির্ঝরের। গত সাতদিন হল নিখোঁজ ভোলা।

হর্ন দিতে দিতে একটা বাস ঢোকে। বাস থেকে কে যেন চিৎকার করে কী বলে—জমিদার পাল্টা খিস্তি করে। জমিদার ড্রাইভার, বয়েস যা তার থেকে অনেক বেশি মনে হয়। চুল প্রায় সব সাদা, ঘাড়ের কাছে দোল খায় বাবরি, বয়েস পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। খাকি প্যান্টের ওপর নেভি ব্লু হাওয়াই শার্ট।

শ্যাম বাসের হেল্পার, পরপর তিনদিন ডিউটি করে আজ ছুটি ওর। জিতু আর জমিদারের দিনের শেষ ট্রিপ হয়ে গেছে। শ্যাম হঠাৎ জমিদারের হাত চেপে ধরে বলে, আমি পারব জমিদারদা?

মাথায় আলতো চাঁটি মারে জমিদার, না পারার কী আছে খোকা? হাতের মুদ্রায় রমণের ভঙ্গি করে বলে, ওটা পারলে এটাও পারবে, ড্রাইভারি ওর থেকে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়!

জিতু খ্যা-খ্যা করে হেসে ওঠে, শ্যাম কি ওটা পারে?

কেন? ধর্মতলায় ওকে নাকি কোন রেণ্ডি পাকড়েছিল? কী রে শ্যাম?

জিতু আরও জোরে হেসে ওঠে, ও তো চুহা, ডরপোক, পালিয়ে এসেছে।

জমিদার অবশ্য তখন গম্ভীর গার্জেনির সুরে বলে, সে ভালোই করেছে, কী না কী রোগ ধরে!

জিতু আরেক দফা হেসে নেয়। এ রুটে তিন মাস কাজ করছে জিতু, লম্বা পাতলা চেহারা, ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল, বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। আধখাওয়া সিগারেট শ্যামের হাতে চালান করে বলে, শিলিগুড়িতে এক রেণ্ডি অনেকদিন ঘুরঘুর করত আমার পেছনে—একদিন কড়কে দিলাম! সারারাত বাস জার্নি করে ঘুম পেত, দুপুরটা ঘুমিয়ে নিয়ে আবার সারারাত বাস জার্নি, ভালো লাগত না ওসব।

শ্যাম বলে, কামাই ভালোই ছিল, বল?

তা ছিল, সাড়ে তিনশো পেতাম পার ট্রিপে, একশো টাকার খোরাকি ছুঁতেই হত না, হোটেলের সামনে বাস লাগালেই গরম গরম টাটকা খাবার, ফ্রি।

বেশ জ্যান্ত আগ্রহ নিয়ে শুনছিল শ্যাম, বাস লাইনে একেবারে নতুন সে, কয়েকমাস হল বদলি ডিউটিতে হেল্পারি করছে, কাজে পোক্ত, হেল্পারের যেমন কাজ—বাস ধোয়া, ইঞ্জিনে জল দেওয়া, স্টার্ট দিয়ে একটু সামনে পেছনে করে দেখে নেওয়া গাড়ি ঠিক আছে কি না, রাস্তায় গাড়ি খারাপ হলে গাড়ির তলায় ঢুকে টায়ার বদলানো। ইচ্ছে ড্রাইভারি শিখবে, জমিদারের পেছনে ক'দিন ধরে ঘুরঘুর করছে।

ভোলার কথা ভাবলেও এদের কথাতেও কান পেতে রাখতে চাইছিল নির্ঝর, এরা কিছু বলে কি না ভোলাকে নিয়ে, এদেরই তো সহকর্মী। অথচ নানা কথায় গড়িয়ে যায় এরা, আর ভেতরে ভেতরে বড়ো অস্থিরতা বোধ করে সে। বৃষ্টি বাড়ে, জানলা দিয়ে আধো অন্ধকারে তাকিয়ে বৃষ্টির উল্লাস অনুভব করতে করতে তার মনে হয় জল নয় যেন তাপ ঝরে পড়ছে। এত বছর ধরে কত বৃষ্টিপাত দেখেছে সে—গ্রীষ্মে বর্ষায় শরতে হেমন্তে শীতে—তবু এই সন্ধ্যায় সুজনডাঙার বৃষ্টি যেন অন্য রকম, যেন বৃষ্টির মধ্যে ঝরে পড়ছে অবৃষ্টির অজস্র কণা।

সাতদিন, কিন্তু তার মনে হয় সাত বছর যেন দেখা নেই ভোলার, আর কি দেখা হবে কোনোদিন? ভোলা কি বেঁচে আছে আদৌ?

যে কথা শুনতে চেয়ে এদের কথায় কান দিতে চাইছিল নির্ঝর, সে প্রশ্নই শুনতে হয় তাকে। পিছন ফিরে তার দিকে জমিদারের চোখে পড়তেই বলে, ভোলার খবর কি কিছু পাওয়া গেল দাদা?

শ্যাম, জিতু থেকে দোকানে বসা অনেকেই কোনায় টুলে মলিন মুখে বসে থাকা নির্ঝরের দিকে ফিরে তাকায়। নীরবে মাথা নাড়ে নির্ঝর।

শ্যাম বলে, শুনছিলাম ইউনিয়ন এ নিয়ে মিটিং করবে।

জিতু চেঁচিয়ে ওঠে, বা—ল করবে ইউনিয়ন! ভোলা কি আর বেঁচে আছে! খরচা হয়ে গেছে, পাঁঠা একটা! শেষে কথাগুলো বলতে গিয়ে গলার স্বর নেমে প্রায় ফিসফিসের মতো শোনায়।

ইউনিয়ন ওর জন্যে ভাববে কেন? ও তো সবসময় ইউনিয়নের পোঁদে কাঠি করে গেছে— মেম্বারও ছিল না, বলতে বলতে হেঁচে ফেলে শ্যাম।

জিতু খিঁচিয়ে ওঠে, বাবা! তুইও দেখি নেত্তা হয়ে উঠছিস! ভোলা আমাদের যে কোনো আপদে-বিপদে থাকত, ইউনিয়ন করত না তা কী হয়েছে?

তোমার শালা ইউনিয়নে এত ঝাল কেন?

তোরই বা এত পীরিত কীসের?

সব মালিক সমান না, ইউনিয়ন থাকলে যা খুশি করতে পারে না মালিক।

চুপ করে যায় জিতু। জমিদার খৈনি টিপছিল, একচিমটে শ্যামের দিকে এগিয়ে দেয়, তারপর খুব নিবিষ্ট স্বরে বলে, ভোলা ছেলে কিন্তু ভালোই। বহুদিন ধরে চিনি ওকে, একটু গোঁয়ার, কিন্তু মন ভালো। জানিস, একবার—বেশ ক'বছর আগে, তখন ফণীবাবুর বাস চালাতাম, ভোলাও ডিউটি করত ওই বাসে। মে দিবসে ডিউটিতে ডবল টাকা, ইউনিয়নের সেক্রেটারি ভোলাকে বাদ দিয়ে তার মহব্বতের লোককে ডিউটি দিতে চাইল ওদিন, অথচ হিসেবমতো ভোলারই পাওয়ার কথা ডিউটি—আমি সিনা টান করে বললাম, ভোলাকে ডিউটি না দিলে আমিও ডিউটি করব না। বাস নিয়ে সোজা চলে যাব গ্যারেজে, মালিক ফণীবাবু আমাদের ইজ্জত দিত, ফোন লাগালাম ফণীবাবুকে, ফণীবাবু সব শুনে বলল, ভোলাকে ডিউটি না দিলে সোজা বাস নিয়ে গ্যারেজে চলে এসো—শেষ পর্যন্ত মাতব্বররা ভোলাকেই ডিউটি দিল।

জমিদারের কথা শুনতে শুনতে নির্ঝরের মনে পড়ে যাচ্ছিল ঘটনাটা, ভোলার কাছেই শুনেছিল।

জমিদারের কথা শুনছিল সবাই, দোকানে ভিড় করে থাকা অনেকেই এই বাসরুটেই কাজ করে—অখিল, বিন্দু, নিতাই।

রুট চালু হওয়ার সময় থেকেই আছে অখিল, বলে, ভোলার দিল ছিল রে—বিপদে-আপদে টুকটাক টাকা-পয়সা ধার চাইলে নিজের কাছে না থাকলে অন্যের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে এনে দিত। কী যে হল! এত গোঁয়ার, একটা রফা টফা করে—

আমাদের কিছু একটা করা উচিত, বলতে বলতে শ্যাম বাঁহাতের কবজিতে পথ ভুলে এসে যাওয়া একটা কালো পিঁপড়েকে দু'আঙুলে পিষে দেয়।

সবাই চুপ। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। থমথমে নীরবতায় গড়িয়ে যায় সেকেন্ড মিনিট। মেঘ ডাকে।

অখিল বলে, কী করবি? কী হল বোঝা গেল কিছু? বোঝা গেলেও পরমান কই? গরিব মানুষ হারাক মরুক—কী আসে যায়!

আমরা সবাই মিলে বাস বন্ধ করে থানা ঘেরাও করতে পারি না?

রাজি হবে সবাই?

মালিকরা হয়তো—

মালিকদের কথা ছাড়, আমাদের সবাই রাজি হবে? একদিনের কামাই ছাড়তে পারবে? বলা শেষ করেই দীর্ঘনিঃশ্বাস অখিলের, ডান বাঁয়ে প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকায়।

অখিলের কালো প্যান্টের ওপর ময়লা পাতলা টি-শার্ট, খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি, পাতলা হয়ে আসা চুল, বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে থুতনি চুলকোতে চুলকোতে বলে, এই রুটে সেই গোড়া থেকেই আছি, কম তো দেখলাম না। ইউনিয়নের নেতারা সব বাইরের লোক, পার্টির লোক, কিন্তু আমরা নিজেরাই যদি ঠিক না থাকি তা'লে—মনে আছে লাস্ট যেবার বোনাস বাড়ানোর দাবিতে এসটাইক হল?

প্রশ্নটা জমিদারের দিকে তাকিয়েই করে, জমিদার মাথা নাড়ে, হ্যাঁ, তবে ঠিক এসটাইক না—ওই ইয়ে, মানে—বাস চলবে কিন্তু আস্তে আস্তে, একটু চলবে দাঁড়াবে আবার চলবে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই গো সোলো!

হ্যাঁ।

সারাদিনে হয়তো এক ট্রিপ চলবে। তা, দশ-বারো দিন চলল ওরকম, কিন্তু মালিকরা দমে না, দাবি মানে না, শেষে আমাদের মধ্যেই কোঁদল, চুকলিবাজি—নেতাদের বারণ না শুনে এসটাইক তুলে নেওয়া হল, মালিকদের কথামতো পঞ্চাশ টাকা বেশি হাতে নিয়েই খুশি থাকতে হল, মনে পড়ে? আর একটা কথা—

কথা থামিয়ে ঘন হয়ে আসা শ্রোতাদের মুখে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় অখিল, বলে, ভোলা কিন্তু ইউনিয়নের মেম্বার না হয়েও শেষ পর্যন্ত এসটাইকে ছিল, বেইমানি করেনি।

আর কেউ কথা বলে না। সবাই চুপ করে শোনে অখিলের কথা। এক আশ্চর্য

কথকের মতো, থেমে থেমে, হাত নাড়িয়ে, ভুরু নাচিয়ে, মাথা দুলিয়ে বলে যায় অখিল, লাভ যদি না হয় বাস চালাবে কেন মালিক? কত ভালো লোক এ লাইনে এসে শেষে আমাদের চুরি-ছ্যাঁচড়ামিতে বিরক্ত হয়ে বাস বেচে দিয়ে চলে গেছে—কত জনকে দেখলাম! ভালো লোক মালিক হয়ে টিকতে পারে এ লাইনে? আমাদের জন্যে শালা ছ্যাঁচড়া মালই দরকার! ভোলা বুঝত এসব, মালিক মানেই তো আর বিশাল বড়োলোক নয়, সবার তো আর অন্য ব্যবসা নেই, বাসের আয়েতেই হয়তো সংসার চলে।

অখিলের পেছনে দোকানের দেওয়াল ঘেঁষে চায়ে চুমুক মারছিল বিশু কনডাক্টর, রুটের ইউনিয়ন সেক্রেটারি সত্যর কাছের লোক, পার্টির কাজকর্মও করছে ইদানীং। চায়ের গ্লাস বেশ শব্দ করে টেবিলে রেখে জিভ ভাঁজ করে মুখের ভিতরে টেনে নিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে বলে, অখিলদা তুমি পুরনো লোক—তক্ক করছি না। কিন্তু এমন করে বলছ যেন মালিকরা সব দ্যাবতা আর যত দোষ—

মুখ বেঁকিয়ে হাত নাড়িয়ে বিশুর বলার কায়দায় হেসে ওঠে অনেকেই।

নিজেদের গলদ থাকলে অন্যের গলদের কথা বলে লাভ আছে?

তা'লে মালিকরা দ্যাবতা নয়?

একটু উত্তেজিত হয় অখিল, পকেট থেকে দেশলাই বার করেও আবার ঢুকিয়ে ফেলে চড়া গলায় বলে, আমরা পয়সা ঝাড়ব, ডিউটি দেব না ঠিকঠাক—এসব নিয়ে মালিক কিছু বললেই ইউনিয়ন পাল্টা ঝাঁপিয়ে পড়বে, বলতে বলতে গলা আরও চড়ছিল অখিলের।

জমিদার জোরে চাপড় মারে টেবিলে, বলে, এ লাইনে আমিও কম দিন নেই—গরমের টাইমে ডিউটিতে কত কষ্ট—শালা জীবন শেষ হয়ে যায়, কে কষ্ট পোয়ায়, আমরা না মালিক? গরমে রাস্তায় আখের রস খেয়ে ফি-বছর কত জনের জন্ডিস হয়, অখিলদা? তোমারই কতবার হয়েছে! অ্যাক্সিডেন্ট হলে কে যায় হাজতে ড্রাইভার না মালিক? রাস্তার গোলমাল হলে জানে মরে কে? আমরা না মালিক?

একসঙ্গে তোড়ে এত কথা বলে হাঁপায় জমিদার। অখিল যেন একটু নিভে আসে, গলা নামিয়ে বলে, কী করা যাবে? যার যেমন ভাগ্য—তা বলে তুমি ফাঁকি দেবে?

ঝমঝম বৃষ্টি আবার ঝিরঝির হয়ে আসে, জানলায় আলতো টোকা মেরে যায় ভিজে বাতাস, কিন্তু ভ্যাপসা গরম বোধ করে নির্ঝর। বৃষ্টি পড়ছে নাকি বৃষ্টির মতো কালো কালো বিন্দু, নির্ঝরের মনে হয় আকাশ থেকে অবিরাম কালো ফোঁটাগুলো পড়ছে তো পড়ছেই, ঢেকে দিচ্ছে সুজনডাঙার বাড়ি ঘর রাস্তা মাঠ সব, ঢেকে যাচ্ছে সুজনডাঙার হৃদয়!

একটা জলজ্যান্ত লোক উধাও হয়ে গেল, অথচ কোনো হেলদোল নেই সুজনডাঙার, কেমন পরম নিশ্চিন্তে বয়ে যাচ্ছে জীবন, কে ভাবছে ভোলার কথা? গৌরী, বাচ্চা দুটো

আর এই আমি, এক সুজনডাঙার মধ্যেই কত সুজনডাঙা, অভিজাত উচ্চ মধ্যবিত্তের সুজনডাঙা, নিম্ন মধ্যবিত্তের সুজনডাঙা আবার ওই রেলবস্তি কিংবা খালধারের বস্তির সুজনডাঙা, এক-একরকম জীবনধারা—কেউ কাউকে চেনে না বোঝে না, যে যার নিজের মতোই বয়ে যায়! কোন্ সুজনডাঙার কথা লিখব আমি?

নিখোঁজ হওয়ার কয়েকদিন আগে চাঁদার টাকা না পেয়ে এক দুপুরে রাস্তায় একলা পেয়ে গৌরীকে হেনস্থা করে নেপুর দলবল, শুনেই নির্ঝর ভোলাকে নিয়ে পুলিশের কাছে যেতে চেয়েছিল, ভোলা রাজি হলেও গৌরী পিছিয়ে গেল। তারপর দিন দুই পরেই জমিতে পা রেখেই হতভম্ব হয়ে গেল ভোলা। ইট বালি সব উধাও। রাগে দুঃখে নেপুর দলবলের উদ্দেশে কাঁচা খিস্তি করতে করতে সোজা চলে গিয়েছিল গৌরীর রবিকাকা, মানে ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার রবি মণ্ডলের কাছে। রবি মণ্ডল তৎক্ষণাৎ ভোলাকে নিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে, এফ-আই আর করে ভোলা। নেপুর দলবলের তোলা চাওয়া থেকে গৌরীকে হেনস্থা করা এবং শেষে ইট বালি উধাও, পুরো বৃত্তান্তটিই স্পষ্টাস্পষ্টি থানায় রেকর্ড করে। শুনে ভোলার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল নির্ঝর। পরদিন থেকেই ভোলা নিখোঁজ। বাসের ডিউটি সেরে রাতে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল, বাড়ি ফেরেনি।

গুণ্ডাদের শাসানি, গৌরীকে হেনস্থা এবং শেষ পর্যন্ত ভোলার নিখোঁজ হওয়া—ব্যক্তিটি যদি ভোলার মতো অশিক্ষিত গরিব মানুষ না হয়ে কোনো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের হত, তাহলে কত হইচই শুরু হয়ে যেত সুজনডাঙা জুড়ে, থানা ঘেরাও, পথ অবরোধ, কাগজ বা কেব্‌ল্ সংবাদ সবাই মিলে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কত প্রশ্ন আলোচনা শুরু করে দিত। তাহলে? শ্রেণীচেতনা, শ্রেণীচেতনাই সব চিন্তা কর্মের সার চালিকাশক্তি? এই একটি ব্যাপারে বোধহয় কোনো সংশয় নেই, কোনো ধূসর অঞ্চল নেই। সুজনডাঙা কি শুধু বাবু ভদ্রলোকদের? সেইসব মানুষদের কথা জানে কেউ, কেউ কি মনে রেখেছে তাঁদের যাঁরা বিনা মজুরিতে বা খুব কম মজুরিতে জঙ্গল কেটে মাটি ফেলে তৈরি করলেন আজকের সুজনডাঙা, স্থানীয় জমিদার মালিকদের সঙ্গে লড়াই করে জমির দখল রাখতে গিয়ে মার খেলেন, রক্ত দিলেন—অথচ শেষ পর্যন্ত একটুকরো জমি পেলেন না তারা এই সুজনডাঙায়? হৃদয়হীন বাবু ভদ্রলোকদের এই সুজনডাঙাকে ঘেন্না করি আমি—নিজের মনে এসব বিড়বিড় করে যায় নির্ঝর।

কিছু একটা করা দরকার—ভাবতে ভাবতে অস্থিরভাবে হাত কচলায় নির্ঝর, ওসি-র সঙ্গে একদিন দেখা করেছে সে। তিনি বলেছেন চেষ্টা করছি আমরা—সাত দিন কেটে গেল, রবি মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে বস্তি কমিটির দীপুর সঙ্গেও কথা বলা যেতে পারে। বাস ইউনিয়নেরও একটা ভূমিকা থাকা উচিত—সেক্রেটারি সত্যের সঙ্গেও কথা বলা দরকার—এইসব ভাবতে ভাবতেই নির্ঝরের মনে পড়ে সেই রাতের কথা, যে রাতে ভোলা জানতে চেয়েছিল, চাঁদ কত দূরে? আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, আসলে ভোলা

নিজের ইচ্ছেয় হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে. দিব্যি বেঁচে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো নদীর পাড়ে? এমন উধাও তো দু-চার দিনের জন্যে নির্ঝরও হয়েছে, সেরকম কোনো খেয়াল চাপল না তো ভোলার মাথায়? নদীর ধারে ঝর্ণার পাড়ে কি কোনো জঙ্গলের পথ ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে, খুঁজে বেড়াচ্ছে ডানা. যে ডানা লাগিয়ে সে সোজা উড়ে যেতে পারে চাঁদে!

মনে পড়ে, সেদিন সে ভোলাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মানুষ কি ঈশ্বর কিংবা ব্যবস্থার হাতে নাচতে থাকা পুতুল? মানুষ কি যন্ত্র, কলকব্জা?

ভোলা বলেছিল, জানো বস্ এক এক রাতে আকাশে নজর করলে দেখি, চাঁদ কেমন ঘোলা আর বিষ্টির মতো ঝরঝর পড়ছে পোড়া মবিল, ডিজেল!

তখন মরে যেতে ইচ্ছে করে তোর?

কী যে বল—মরব কেন?:

জীবন ভালো লাগে তোর?

ভালো-মন্দ সব নিয়েই—তুমি বড় আলফাল ভাব, কম ভেবে বাঁচো দেখি, খাটো খাও লাফ মেরে চাঁদে চলে যাও, দেখবে বাঁচতে কত মজা!

ভোলা একটা ছোট্ট লাফ মেরে রাস্তায় পড়ে হো-হো হেসে উঠেছিল।

কেমন ভাবনাহীন সংশয়হীন থাকা তোর ভোলা, খাটো খাও, কিন্তু আমি পারি না যে এমন! ভোলা, কাজহীন কেবল ভাবনা আর ভাবনাহীন পশুর মতো ঘাড় গুঁজে কাজ করে যাওয়া দুটোর কোনোটাই বোধহয় মানুষের জীবন নয়—আজ মনে মনে ভোলার সঙ্গে এমন তর্কে মেতে উঠতে পারে নির্ঝর।

ভোলা, শুধু প্রশ্ন আর সংশয় নিয়েই কেটে গেল আমার এতগুলো বছর, চেতনার বৃষ্টি-অবৃষ্টি আলো-অন্ধকারে পথ হাতড়িয়ে চলা শুধু, এক প্রশ্নের উত্তর পেতে না পেতেই জন্ম নতুন প্রশ্নের, জীবন যেন এক আলো-আঁধার রহস্যঘন পথ। শুধু চলা আছে গন্তব্য নেই—আচ্ছা ভোলা তুই বল, মানুষ কি ব্যবস্থার হাতের পুতুল? অর্থনীতি কি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বদলালেই কী আপনাআপনি বদলে যাবে মানুষ? তাই কি হয়? মানুষ কি যন্ত্র না কি কলকব্জা? নিছক দারিদ্র্যের আক্রোশে সংঘবদ্ধ মানুষ যদি কোনো নতুন ব্যবস্থা তৈরি করে তা কি রাখা যাবে যদি ক্রমাগত ভেতরের মানুষটা না পাল্টায়? যদি না মানুষ পথ হাঁটে তার মতো করে চেতনার দ্বন্দ্বে সংঘর্ষে, যদি না সে গায়ে মেখে নেয় অন্তরের বৃষ্টি-অবৃষ্টি আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তা তবে সে কী করে নিয়ামক হবে ইতিহাসে? ভোলা, দ্যাখ আমাদের চারপাশে ক্ষমতা দখলের যত আয়োজন যত সংগঠন যত মিছিল, কিন্তু ব্যক্তিচৈতন্যকে আলোকিত করার আয়োজন কতটুকু সে তুলনায়? তুই নিখোঁজ হয়ে গেলি ভোলা অথচ সুজনডাঙা কেমন নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে যাচ্ছে। সুজনডাঙা নিয়ে আমি কী লিখব বল?

বৃষ্টি থেমে গেছে। উঠে দাঁড়ায় নির্ঝর, প্যান্টের পকেটে অযত্নে ঢোকানো রুমালটা পড়ে যায়, খেয়াল করে না।

সেদিন রাস্তায় হো-হো হাসছিল ভোলা, নির্ঝর জিজ্ঞেস করেছিল, মরতে ভয় করে তোর?

ভোলা বলেছিল, আবার মরার কথা! দিব্যি বেঁচে আছো তাই—মরণের সামনে পড়লে বুঝতে!

দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা রেখে নির্ঝরের মনে হয় চারপাশে অবৃষ্টির ঝমঝম শব্দ! বুকের ভেতর খরালি বাতাস, যেন হু হু ওড়ে তপ্ত শুকনো ধুলো। তবু বাতাসে বৃষ্টির শব্দ খোঁজে সে, বুকভরে শ্বাস নেয় বারবার।

দু'চোখে বৃষ্টির মেঘ।

## বারো

তোর প্রিয় গান, শুনছিস?

দুপুরের খাওয়ার শেষ গ্রাস মুখে তুলে জড়ানো স্বরে শেফালির দিকে তাকিয়ে বলেন মল্লিকা। পাশের বাড়িতে স্টিরিওতে বাজছিল—তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। টিফিন কেরিয়ারটা বেসিনের জলে ভালো করে ধুয়ে নিতে নিতে শেফালি মৃদু হাসে, বলে, শুনে শুনে কান পচে গেছে, এখন আর ভালো লাগে না মাসিমা।

কী একটা বলতে গিয়ে বিষম খান মল্লিকা, শেফালি এসে গ্লাসে জল ভরে এগিয়ে দেয়, বলে, কেউ বুঝি ভাবছে তোমার কথা?

দু-তিন ঢোক জল খেয়ে মল্লিকা বলেন, কে আর ভাববে?

দাদা ভাবতেছে হয়তো, নাকি—

তোমার দাদার বয়েই গেছে তার মায়ের কথা ভাবতে, পৌনে দুটো বাজল সে বাবুর দেখা নেই, দেখ গে কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ডাইনিং টেবিল থেকে থালা-বাসন তুলে এগোবার উদ্যোগ করতেই শেফালি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয়, বলে, দেন আমায়, আপনি হাত ধুয়ে নেন। ধীরে বেসিনের দিকে এগিয়ে মল্লিকা বলেন, চিচিঙ্গার তরকারিটা পুরো নিয়ে যা, ও তো তোর দাদা খাবে না—

পুরো নেব, ও-বেলায় খাবা না তোমরা?

না, আমারও ভালো লাগে না, আর বাড়ির বড়কত্তা পরপর দুদিন খেলে তেনার ও বেলায় রুচবে না।

থালা-বাসনগুলো খাওয়ার ঘরের মেঝেয় এককোনায় রেখে শেফালি রান্নাঘরের

সিমেন্টের তাক থেকে পানের বাটা, খয়ের সুপুরির কৌটো, চুনের পাত্র নিয়ে টেবিলের একধারে রাখে। ধোয়া টিফিন কেরিয়ার নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যায়, কেরিয়ারের বাটিগুলোয় ভাত ডাল তরকারি ভরে নেবে। ভোর ছ'টা-সাড়ে ছ'টায় এ-বাড়ি চলে আসে, দুপুরে কোনোদিন থাকে কোনোদিন আজকের মতো খাবার নিয়ে বাসায় যায়, ফের বিকেলে চলে আসে, রাত ন'টা-সাড়ে ন'টায় ফিরে যায় আবার। প্রায় বছর দুই একটানা এ-বাড়িতে কাজ করছে শেফালি। মাঝেরগ্রামের সুভাষপল্লীতে ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। সংসারে আছে অসুস্থ শাশুড়ি, স্বামী। ছেলেপুলে নেই। স্বামীর মাথায় গোলমাল, ট্রেনে হকারি করে, কোনোদিন কাজে বেরোয় আবার ইচ্ছে না হলে শুয়ে থাকে বাড়িতে।

মল্লিকা গুনগুন করে গেয়ে ওঠেন, স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা—শেফালি গলা তুলে বলে, মাসিমা ওই গানটা গাও দেখি।

কোন্ গান?

ওই যে—

বাঁশবাগানের—

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

এই ভরদুপুরে বাঁশবাগানের মাথার উপরে চাঁদ! ধ্যাৎ, তোর কোনো ইয়ে নেই!

ও, সাধলাম বলে দাম বাড়াচ্ছ!

দাম বাড়িয়ে আর কী হবে?

তোমার গলা খুব মিষ্টি গো মাসিমা, সত্যি বলছি, এত বয়েস হয়ে গেছে, ঠিক যেন লতার মতো!

চুপ! চুপ! কী বলছিস তুই জানিস? কার সঙ্গে কার তুলনা! বলতে বলতেই ঘাড় উঁচু করে মাথার উপর ঘুরতে থাকা ফ্যানের দিকে তাকান, ফ্যানটার কী হয়েছে রে! হাওয়া হচ্ছে না ক'দিন ধরে, কী গরম!

সকালে ঝমঝমিয়ে বেশ কয়েক পশলা ঢেলেছিল; তারপর মেঘলা আকাশ, গুমোট গরম। প্যাচপ্যাচে ঘাম শরীর জুড়ে, পানের বাটায় হাত দেবার আগে গামছা দিয়ে আরেকবার ঘাড় গলা কপাল মুখ মুছে নেন মল্লিকা। কাঁসার বাহারি বাটা টেনে নিতে নিতে মল্লিকার মনে পড়ল বাবার কথা। এই বাটায় পান থাকত বাবার, ভাই-বোনের মধ্যে বাবার পানের নেশা পেয়ে বসেছিল মল্লিকারই। বাবা বলতেন, আমি মরে গেলে এই বাটাটা তুই নিয়ে যাবি, পান খাবি আর আমার কথা ভাববি। পান সাজতে সাজতে মল্লিকা একটু উদাস স্বরে বললেন, আমার গান আর কী শুনলি, সে এক সময় ছিল আর সত্যি ভালো গাইতেন আমার বাবা। কী দরাজ সুরেলা গলা! নজরুলগীতি, রাগপ্রধান, গজল—এইসব গাইতেন।

টিফিন কেরিয়ারে সব গুছিয়ে নিয়ে শেফালি টেবিলে রাখে। মল্লিকা বলেন, যাবি?

আরেকটু বসে যা। টেবিল থেকে বাসন-পত্র তুলে এঁটো বাসনের মধ্যে রাখে। দু-একটা বাটি দেখেশুনে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেয়, ন্যাতা দিয়ে মুছতে থাকে টেবিল।

খুলনা শহরে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝেই গানের আসর বসত, সন্ধে থেকে শুরু হয়ে সারারাত ধরে চলত। কত বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়েরা আসতেন। আর বছরে অন্তত একবার আসতেন বাবার গুরুদেব। সোজা হায়দ্রাবাদ থেকে চলে আসতেন আমাদের বাড়ি। দিন সাতেক থাকতেন। সেই সাতদিন আমাদের বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টাই যেন গান আর গান—গোটা বাড়িটাই সুরপুরী হয়ে থাকত! ওই গুরুদেবের কাছেই বাবা খুব যত্ন করে খেয়াল শিখেছিলেন। যখন আসতেন আমাদের বাড়ি বাবা তখনই ওঁর কাছে তালিম নিতেন—বলতে বলতে একটা সাজা পান বাড়িয়ে দেন শেফালির দিকে।

পাশের বাড়ি থেকে পাশ্চাত্য বাজনা ভেসে আসে, তবে ভল্যুম কমেছে। কাক ডাকে, কোথা থেকে একটা বোলতা ঢুকে পড়ে। শেফালি ঝটপট ঝাঁটা তুলতে না তুলতেই পালিয়ে যায়।

বাবা চলে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকটা বছর আর গাইতে পারতেন না এক কলিও, সে যে কী কষ্ট!—বলতে বলতে গলা ধরে আসে মল্লিকার।

মল্লিকার দেওয়া পানটা কাগজে মুড়ে আঁচলে বেঁধে নেয় শেফালি। চেয়ার টেনে নিয়ে আরও কাছে এসে বসে।

মাসিমা!

হুঁ।

তোমার মনে খুব কষ্ট, না?

কেন রে?

না, আজকাল প্রায়ই দেখি কথা বলতে বলতে তোমার চোখে জল এসে যায়।

ও তুই বুঝবি না।

কী?

বয়েস হোক আমার মতো, বয়েস হলে ওরকম হয়।

আমি মাঝে মাঝে—, থেমে যায় শেফালি।

কী?

মাঝে মাঝে ভাবি মানুষের কত রকমের দুঃখু! আমার একরকম, তোমার একরকম, কেউ সুখী নেই!

চুপ করে থাকেন মল্লিকা। পান মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে কেমন এক ম্লান হাসি ছেয়ে যায় তার মুখে।

একটা গান মনে পড়ছে।

গান?

হ্যাঁ, সুখের কথা বোলো না আর বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি!

দাদাকে নিয়ে তোমার খুব ভাবনা, না?

কী হবে আর ভেবে!

তবু, বুঝি, মায়ের মন।

আসলে কী জানিস, অনেকের জীবনের প্রথম দিকে অনেক ঝঞ্ঝাট দুঃখ-কষ্ট থাকে, আমাদের এই সুজনডাঙায় রিফিউজি হয়ে এসেছিল কমবয়েসী যারা, কত ঝড়-ঝাপটা ঠেলে এগিয়েছে সব, কিন্তু তারা শেষ জীবনে এসে খানিকটা শান্তি পেয়েছে, কিন্তু আমার—

তুমি কত বছর আছ এখানে?

সে—অনেক বছর, প্রায় গোড়া থেকেই, রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে কয়েক মাস ছিলাম, তারপর বাহান্নতে সুজনডাঙায়। ক্যাম্পে সেইসব দিনগুলো—কী কষ্ট ভাবতে পারবি না। বাবা একটুও বিষয়ী মানুষ ছিলেন না, জমিজমার আয় থেকে কোনোক্রমে সংসার চলত ওপারে। উনি সারাদিন গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকতেন। জ্যাঠা-কাকারও সেরকম কেউ কিছু রোজগার—মানে চাকরি-বাকরি করতেন না। জ্যাঠা তো ওপারেই থেকে গেলেন, অনেক বয়েসে প্রায় শেষ জীবনে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে চলে আসেন, তখন বাবা আর বেঁচে নেই।

পিকদানিটা মুখের কাছে এগিয়ে নেন মল্লিকা। শেফালি খুব নিবিষ্ট শ্রোতা হয়ে তাকিয়ে ছিল মল্লিকার দিকে।

সুজনডাঙায় এসে প্রথমে ক্যাম্পে থাকতাম, তারপর—

ক্যাম্পে?

হ্যাঁ, ক্যাম্পে! বিশ্বাস হচ্ছে না? ক্যাম্প! তাঁবু, তাঁবু!

তোমরা তাঁবুতে থেকেছ!

তোমরা মানে বড়কত্তা কিংবা তোর দাদার বাবা এরা নয়, আমাদের পরিবার, মা বাবা ভাই বোন আমরা সবাই।

বিশ্বাস হয় না!

বলে হাসতে থাকে শেফালি। হাসে আর মাথা নাড়ায়।

বিশ্বাস না হওয়ারই কথা, এখনকার সুজনডাঙা দেখলে, আজ আমাদের বাড়িঘর দেখলে কে বিশ্বাস করবে যে প্রায় সাত-আটশো পরিবার ওই বাহান্ন সালে প্রথম এসে তাঁবুতে থাকত। আজ প্রায় তাদের সকলেরই পাকা বাড়ি-ঘর, অনেকে আরও নামি-দামি জায়গায় বাড়ি করে ফ্ল্যাট কিনে চলে গেছে—,যেমন আমার ভাইরা, ভাইপোরা।

খুব কষ্ট ছিল তোমাদের! দেশের দালান-কোঠা ছেড়ে এসে তাঁবুতে থাকা, ভাবা যায় না গো!

সব সয়ে যায়। মানুষ তেমন পরিস্থিতিতে পড়লে কত কিছু যে সইতে পারে, তা সে জানে না রে! প্রাণ বাঁচানোর দায়ে সব মেনে নেয়! না মেনে উপায় কি বল?

আচ্ছা মাসিমা, একটা কথা বলি?

বল।

তোমরা সবাই দলে দলে অত লোক দেশ ছেড়ে এদিকে চলে এলে কেন? বন্যা হয়েছিল নাকি রোগ লেগেছিল? নাকি জয়বাংলার যুদ্ধ?

শেফালির কথা শুনে এবার হাসতে শুরু করেন মল্লিকা। হাসতে হাসতে কাশি এসে যায়।

ওমা! এত হাসির কথা কী বললাম?

তুই আমার পান খাওয়াটা মাটি করলি দেখি, বলতে বলতে আরেক দফা কাশতে থাকেন মল্লিকা।

শেফালি!

কী হল?

তুই যে দেশটায় থাকিস তার নাম জানিস?

কী যে বল, অত মুখ্যু ভেবো না আমায়। আমি ক্লাস ফোর অবধি পড়েছি, নাম সই করতে পারি, চিঠিও লিখতে পারি।

বল।

কী?

ওই—যে দেশে থাকিস তার নাম।

সত্যি মাসিমা, তুমি না মাইরি!

বল।

ইন্ডিয়া, ভারত, ভারত।

বাঃ, তো সাতচল্লিশের আগে আমাদের ওই দেশটা ভারত—ভারতবর্ষ ছিল, তার পরে ওটা বিদেশ হয়ে গেল।

যাঃ!

যাঃ—কী রে? সত্যিই তাই হয়েছিল।

বিদেশ? তোমরা তাহলে জয়বাংলার লোক!

না, ভারতের লোক। আমি যখন খুলনায় জন্মেছি তখন ওটা ভারত ছিল। তোর জন্ম কোথায়?

আমার?

হ্যাঁ।

মুর্শিদাবাদে। দু'বছর বয়েসে চলে এসেছিলাম। খুব বন্যা হয়েছিল। উল্টোডাঙার

কাছে লাইনের ধারে ছিলাম কয়েক মাস, তারপর এই মাঝেরগ্রামে। মুর্শিদাবাদ, উল্টোডাঙা এসবের কথা কিছুই মনে নেই আমার। মনে হয় জন্ম থেকে যেন মাঝেরগ্রামেই আছি।

ধর, আজ যদি তোর মুর্শিদাবাদ বিদেশ হয়ে যায়, তুই কি ভারতের লোক হবি না?

তা কেন, ভারতের লোকই থাকব। সত্যি, তোমাদের কত কষ্ট হয়েছিল! নিজের বাড়িঘর জমিজমা সব ছেড়ে এসে—সত্যি, আমার বাপ-মায়ের ব্যাপার ছিল অন্যরকম, ঘর ভেসে গিয়েছিল, কাম-কাজ ছিল না, সে এক ব্যাপার! কিন্তু তোমাদের—

আমরা সাত-আটশো পরিবার জমি পেয়ে ক্যাম্প ছেড়ে চলে এলাম, পরে আরও কিছু লোক এসেছিল, তারা সবাই অবশ্য এখানে শেষপর্যন্ত জমি পায়নি, কেউ কেউ আন্দামানে দণ্ডকারণ্যে চলে গেল, মানে যেতে বাধ্য হল। সেসব যে কী দিন!

তবে মাসিমা, তোমাদের ব্যাপার একরকম, কিন্তু আমার বাবা বলত ওই গ্রামদেশ থেকে চলে এসে, কলকাতার এত কাছে থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে আমাদের। বিয়ে তো দেখেশুনে ভালোই দিয়েছিল। স্বামীর তখন কারখানায় চাকরি, ভালো মাইনে, মাথার দোষ হলে আর বাবার কী দোষ, সবই কপাল আমার!

সে যদি বলিস, অনেক কিছু ভালো আমাদেরও হয়েছে। আমরা মানে শুধু আমাদের পরিবার নয়, যারা ও-দেশ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের অনেকের কথাই বলছি।

কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে, না মাসিমা?

খানিকটা মেলে বইকি! জানিস, তখন সুজনডাঙায় আমরা যারা থাকতে শুরু করলাম, প্রথম প্রথম আমাদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গিয়েছিল। রিফুইজিদের মধ্যেও ভাগাভাগি!

দল? পার্টি?

না, না, ও-দল নয়, ক্যাম্প রিফুইজি আর সোসাইটি রিফুইজি।

মানে?

মানে, যারা প্রথমে এসে কো-অপারেটিভ গড়ে জমি পেয়ে থাকত তারা সোসাইটি রিফুইজি, আর আমরা যারা পরে এসে তাঁবু থেকে উঠে ঘর বাঁধলাম, তারা সব ক্যাম্প রিফুইজি! দু'দলের মধ্যে নানা ঝগড়া—মূলত উন্নতিকে নিয়ে, ক্যাম্প রিফুইজিরা যে অঞ্চলে থাকতেন সেখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটি যথেষ্ট উন্নতি করছে না—এ বাবদ সরকারি সাহায্যের টাকা অন্য অঞ্চলে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—এসব অভিযোগ নিয়ে কত গণ্ডগোল! সোসাইটি রিফুইজিরা যেন ক্যাম্প রিফুইজিদের একটু নিচু নজরে দেখত! তবে মজার কথা কী জানিস?

কী?

সেই ক্যাম্প রিফুইজিদের একজনই আজ সুজনডাঙার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

আমি এবার যাই।

উঠবি? অনেক বেলা হল. তোদের জ্যাঠামশাইয়ের কোনো পাত্তা নেই!

উনি আজকাল বড় অনিয়ম শুরু করেছেন।

আজকাল? চিরকালই। তুই যখন থেকে দেখছিস. তখন একবছর হঠাৎ একটু নিয়ম মানা শুরু করেছিলেন. শরীর বিগড়ে বসেছিল. ইদানীং হয়তো আবার একটু চাঙ্গা হয়েছেন. ব্যাস, টো-টো কোম্পানি শুরু হয়ে গেছে।

তবে মানুষটা বড়ো ভালো।

তা ভালো, সে ওর ভাইও। আমার পোড়াকপাল ধর করতে পারলাম না, চলে গেল ফেলে রেখে।

মুখখানা নিভে আসে মল্লিকার। বিষণ্ণতার এক টুকরো মেঘ যেন ছায়া ফেলে যায়।

ছবি দেখে মনে হয়—মেসো দেখতেও খুব ভালো ছিল, তাই না?

হ্যাঁ, যাকে বলে একেবারে সুপুরুষ। লম্বা, চওড়া, টুকটুকে ফর্সা, ঝকঝকে চোখ, খাড়া নাক। ছটফটে, দুরন্ত, সেই মানুষটা যে হঠাৎ ওভাবে— শুনে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

বলতে বলতে আবার গলা ধরে আসছিল মল্লিকার। চোখের কোণ ছলছল করে ওঠে। চুপ করে যান।

যাই—বলাও আর ওঠা হয় না শেফালির। কথা ঘোরাতেই সে বলে, তা মাসিমা, দেশ ছেড়ে এসে তোমাদের সবার ভালো হয়েছে বলছিলে, কী ভালো হল?

অ্যাঁ?

ওই যে বলছিলে না একটু আগে?

ও, হ্যাঁ—অন্য এক স্মৃতি থেকে ফিরে আসতে মল্লিকার যেন একটু সময় লাগে। ভালো হয়েছে, মানে, সে অনেক কথা—

আচ্ছা, পরে শুনব তাহলে—বলেই উঠে দাঁড়ায় শেফালি, কিন্তু মল্লিকা থামে না। দেশে আমাদের অনেক সংস্কার, জাতবিচার ছিল। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ছোটো জাত, বড়ো জাত—কত রকমের, কিছু মনে করিস না—ধর, তুই যে আজ রান্নাঘরে ঢুকছিস, এক হাঁড়ির ভাত খাচ্ছিস—দেশের বাড়িতে ওসব ভাবাও যেত না, কিন্তু রিফুইজি হয়ে এসে ক্যাম্প, প্ল্যাটফর্মে, কলোনিতে ওসব জাতবিচার আর কোথায় রইল বল! সব ভেসে গেল, ব্রাহ্মণ-শূদ্র একাকার হয়ে গেল! সে তো ভালোই হল।

তা বটে।

গ্রামের জীবনে এমনকি শহরেও মোটা ভাত-কাপড়েই সব সন্তুষ্ট থাকত। কোনোক্রমে দিন গুজরান করে দিত বেশিরভাগ লোক। যৌথ পরিবার, একজনের আয়ে অন্যরা দিন কাটিয়ে দিত।

সে তো ঠিক—বলতে বলতে টিফিন কেরিয়ার তুলে নিয়ে বেরুনোর উদ্যোগ করে শেফালি। কিন্তু মল্লিকা কথা শেষ না করে যেন ছাড়বেন না। বলেই চলেন—আর এখানে এসে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান করতেই প্রাণপণ লড়াই, মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করতেই হিমশিম। যৌথ পরিবার ভেঙে গেছে, যে যার নিজের লড়াই করতে হয়েছে। লড়াই করতে করতে একসময়ে অল্পে সন্তুষ্ট অলস মানুষগুলো বদলে গেল। অনেক বেশি লেখাপড়া করল, ভালো চাকরি-বাকরির চেষ্টা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুতেই অনেক উন্নতি হল—দেশের বাড়িতে থাকলে এত লোকের এরকম উন্নতি হত কী? হিসেব করলে দেখা যাবে, চাকরি বা ডাক্তার-উকিলের নানারকম পেশায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সব কিছুতেই এ-দেশি মানে যাদের একসময় ঘটি বলা হত তাদের থেকে ঘর ছেড়ে আসা বাঙালরা সব কিছুতেই অনেক এগিয়ে গেছে।

বৃষ্টি থামবে মনে হচ্ছে, মাসিমা, যাই আমি—শেফালি এবার আর দাঁড়ায় না।

ছাতা নিবি?

না, না।

কেন? নিয়ে যা, ভিজে আবার ঝামেলা বাধাবি!

বৃষ্টি নামতে নামতে পৌঁছে যাব।

তুই আজকাল বড়ো অবাধ্য হয়ে উঠেছিস!

আচ্ছা, নিচ্ছি—টেবিলে ফের টিফিন কেরিয়ার রেখে, ঘরে ঢুকে দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো ফোল্ডিং ছাতাটা টেনে নিয়ে ছুট লাগায় শেফালি।

আস্তে উঠে মল্লিকা দরজা ভেজিয়ে ছিটকিনি দিয়ে দেন। রান্নাঘরে উঁকি মারেন একবার, হাঁটতে গিয়ে হাঁটু থেকে নীচের দিকে বেশ ব্যথা বোধ করেন।

রান্নাঘর, ডাইনিং সব নজর বুলিয়ে দেখে নিয়ে আপন মনেই বিড়বিড় করেন, মেয়েটা সব কাজ সেরে রেখে গেছে।

ভারি মমতা জন্মে গেছে শেফালির ওপর। বাড়ির একজন যেন! ভারি ভালো মেয়ে। কথাবার্তা ধরনধারণ চালচলন—কোনো কিছুতেই বোঝার উপায় নেই সে বাবু ভদ্রলোক ঘরের মেয়ে নয়! কাজকর্মও বেশ পরিপাটি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অল্প খুঁড়িয়ে হেঁটে ভেতরের ঘরের দেওয়ালঘড়িতে তাকান মল্লিকা, দুটো পনেরো।

বড়কত্তার আজ হল কী? দেরি করলেও মোটামুটি দেড়টা থেকে দুটোর ভেতর এসে যায়। আজ কী কোনো বিশেষ কাজ—মনে করতে চেষ্টা করেন মল্লিকা।

ভোলা উধাও হয়ে যাওয়ার পর ছেলেটা তো নাওয়া-খাওয়া ভুলে ছিল ক'দিন। থানা-পুলিশ, পার্টি অফিস খুব দৌড়োদৌড়ি করেছে। বড়কত্তা কি ভাইপোর সঙ্গেই আজ—হ্যাঁ, কাল যেন কথা হচ্ছিল জ্যাঠা-ভাইপোয়। এম-এল-এ'র সঙ্গে কথা বলবে।

রাগ হয় মল্লিকার। বলে যেতে পারে তো! কোথায় যাচ্ছে, কখন আসবে কিছুই বলে যায় না। অন্তত কমলেশের তো বলে যাওয়াই উচিত। এত বয়েসে দেরি হলেই কেমন যেন চিন্তা হয়, উদ্বেগ হয়, আর উদ্বেগে অম্বল বাড়ে, অম্বলে মেজাজ খিটখিটে হয়—ভাবতে ভাবতেই নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় আধশোয়া।

এ বাড়ির বংশধারাতেই কি বাউণ্ডুলেপনা রয়ে গেছে? ছেলেটা আমার পুরো বাউণ্ডুলেই রয়ে গেল—কী হবে ওর? আমি চোখ বুজলে কী হবে ওর? ওর জ্যাঠার না হয় একটা ভাই ছিল, তাই ভাই-বৌ, ভাইপো পেয়েছেন। তাছাড়া দু-দুটো বোনও আছে। কিন্তু নিরুর কী হবে? আমার যদি আর একটা ছেলে বা মেয়ে থাকত! এত বয়েস হয়ে গেল নিরুর—আচ্ছা, ওর শরীরের কোনো গোলমাল নেই তো? পুরুষমানুষের অন্য চাহিদাও তো থাকে! সে সবও কি—ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে আসে মল্লিকার। আধশোয়া শরীরটা পুরোপুরি লেপটে যায় বিছানায়।

ঘুমঘোরের পিছু পিছু মল্লিকার সামনে কে এসে দাঁড়ায়? লম্বা, ফর্সা, সুপুরুষ মানুষটিকে কতদিন দেখেননি মল্লিকা। রক্তমাংসের মানুষটা কত আগে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়ে গেছে।

কেমন আছ মল্লিকা?

বেশ আছি! দেখতে পাও না? চোখ দুটো কি গেছে তোমার?

ঝগড়া করার অভ্যেসটা এখনও যায়নি তোমার?

আমায় ফেলে রেখে দিব্যি চলে গেলে। এখন আবার ঢং করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কেমন আছ?

খুব রেগে আছ!

আমায় নেবে তুমি, তোমার কাছে?

নিরুর কী হবে?

যা হবার হবে। এতদিন তো টানলাম। তুমি চলে যাওয়ার পরে ওকে আঁকড়ে ধরেই তো বেঁচে ছিলাম। স্কুল ছিল, কেটে যেত একরকম—আর ভালো লাগে না এখন। ভেবেছিলাম নিরুর বউ আসবে, নাতি-নাতনিকে নিয়ে হইচই করে—কিছুই হল না। আমার আর ভালো লাগে না। তুমি নেবে আমায়?

উত্তর আসে না। নিরুত্তর মানুষটি অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে যায়।

মল্লিকার ঠোঁট নড়ে। একটানা বলে চলেছেন তিনি, আমার আর ভালো লাগে না, নিয়ে চল আমায়।

## তেরো

মানুষ কি ঈশ্বর কিংবা কোনো ব্যবস্থার হাতের পুতুল? মানুষ কি যন্ত্র বা কলকব্জা?

রবি মণ্ডলকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হল নির্ঝরের। যে প্রশ্ন বারেবারে তার মনে উঁকি মেরে যায়। চারপাশে কেমন যেন জীবনের সব কিছুকে একটা ছকের মধ্যে ফেলে কাটাছেঁড়া করার আয়োজন। কেউ সহজ সমাধান জানায় ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে, কেউ বা খুঁজে আনে সমাজব্যবস্থা নামক নতুন ঈশ্বর—ছকহীনতার অনিশ্চয়তাকে কি ভয় পায় মানুষ?

সকাল দশটার রোদ গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বারান্দায় লুটিয়ে আছে। কথা চলছিল। ফোন ধরতে ঘরের ভেতর গেছেন রবি। একতলা ছোট্ট এই বাড়ির সামনে একফালি উঠোনে চমৎকার বাগান। নানা জাতের পাতাবাহার, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা।

বেশ বড়ো এই গ্রিল-ঘেরা বারান্দাই বসার ঘর, ছোটো টি-টেবিল, হাতলওয়ালা ও হাতল-ছাড়া কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার। টেবিলে ভাঁজ করে রাখা দু-তিনটি বাংলা ইংরাজি খবরের কাগজ।

পাঁচ-ছয় সপ্তাহ হয়ে গেল ভোলার কোনো খবর নেই। পুলিশ-প্রশাসন-পার্টি সব জায়গায় আবেদন নিবেদন ও আন্দোলন—সব মিলিয়ে নির্ঝর চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। বাস ইউনিয়ন এবং বস্তি কমিটির পক্ষ থেকে এস. পি.-র কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে রবির সাহায্য পেয়েছে যথেষ্ট। ফল হয়েছে একটাই, নেপুকে তার শাগরেদ-সহ এলাকায় আর দেখা যাচ্ছে না।

প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, নানা লোকজন মারফত প্রচ্ছন্ন হুমকি শুনতে হয়েছে নির্ঝরকে। নেপুর বস্ হাতকাটা খোকনের প্রবল প্রতাপ এবং ভোলার ব্যাপারে নির্ঝরের 'বাড়াবাড়ি'তে সে যে অসন্তুষ্ট—এ সংবাদ অনেকেই তাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে বাড়ি বয়ে এসে দিয়ে গেছে।

গত সপ্তাহে নির্ঝরের এক সহপাঠী, ইদানীং ছোটোখাটো বিল্ডিং প্রমোটারিতে যুক্ত, অজয় এসেছিল বাড়িতে। আগে থেকে ফোন করে জানিয়ে সন্ধেয় এল। একথা-সেকথা, পুরনো দিনের কথা—এসব বলতে বলতেই ভোলার প্রসঙ্গে এল। সহানুভূতিসূচক মামুলি দু-একটা কথা বলেই আসল কথাটা, নির্ঝর জানে যে কথা বলতে বছর দশ-বারো পর হঠাৎ সহপাঠীকে তার মনে পড়ল। বেশ কায়দা করেই পাড়ল।

তুই কি সেই বাউণ্ডুলে হয়েই থাকবি? ব্যবসা-ধান্দা কিছু করবি না? ভোলা-টোলার ব্যাপার নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? বস্তির ওসব ছোটোলোকদের জীবনে ওরকম হয়েই থাকে! তাছাড়া--

বল।

নির্ঝরের চোখে চোখ ফেলে অবশ্য একটু নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল সে। চোখ নামিয়ে একটু সরু গলায় বলল, তুই যা ভাবছিস তা নাও হতে পারে। নিজেই কোথাও ভেগে গেছে দ্যাখ, চলে আসবে।

বুঝলাম।

অ্যাঁ?

যা বললি সব বুঝলাম। বস্তির ছোটোলোকদের জীবনের দাম খুব কম, এই তো? ভদ্রলোকরা এই নিয়ে কেনই বা মাথা ঘামাবে?

কথার মধ্যে যে ব্যঙ্গের সুর ছিল সেটা ধরতে অসুবিধা হয়নি অজয়ের। কিন্তু তবুও যেন সে শুরুর দিকের অস্বস্তি কাটিয়ে বেশ মুরুব্বির চালেই বলে, জীবনের দাম? আচ্ছা তোর জীবনের দাম কত হবে?

কত?

তুই বল।

আমি জানি না, তুই-ই বল।

তোকে খরচা করে দিলে সুজনডাঙায় একটু হইচই হবে। ভদ্র শিক্ষিত ঘরের ছেলে তুই। তাছাড়া তোর জ্যাঠার কিছু কানেকশন আছে। তাই তোর ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা খানিক বেশি ছড়াতে হবে—পুলিশ, উকিল সব মিলিয়ে কত লাগবে—ধর যাট, সত্তর, খুব বেশি হলে আশি হাজার।

না, না, অনেক বেশি বললি। এখানে কে একজন আছে শুনেছি এক বোতল দেশি মদ আর হাজার দুই টাকা দিলেই নাকি বডি ফেলে দেয়। তারপর লোকাল ফাঁড়ির এ. এস. আই. যে কেসটা ডিল করবে তাকে না হয় হাজার পাঁচ-দশ দিয়ে দিলেই হল, নাকি? জেঠুর কানেকশনে যাই হোক—কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দেবে কি কেউ? তাছাড়া বডি পুরো লোপাট করে ফেলতে পারলে তো আর কথাই নেই।

নির্ঝরের এই জবাব শুনে চোখ-মুখ মিইয়ে গিয়েছিল অজয়ের। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলেছিল, একসঙ্গে পড়তাম তাই যা ভালো বুঝেছি বললাম। আসলে নেপু, হাতকাটা খোকন এরা খুব সুবিধার লোক নয় জানিস। দু'নম্বরী পয়সা আছে, পুলিশ থেকে বড়ো নেতা পর্যন্ত সব দিকে ওদের জমজমাট লাইন। ভোলা এমন কে যে তার জন্যে তুই এত ঝক্কি নিবি?

সবসময় সব ব্যাপার এত সহজ হয় না রে! তা যদি হত তাহলে আমি যা করছি, আমার মতো সামান্য এক মানুষ, তাতেই বা তুই যাদের নাম বললি ওইসব ক্ষমতাবান রাক্ষস-খোক্কসদের এত ভয় কীসের?

একথার পর একেবারেই চুপ মেরে গিয়েছিল অজয়। দু-একটা মামুলি কথা বলে বেরিয়ে এসেছিল। চেয়ারে গা এলিয়ে মন তোলপাড় করে অজয়ের সঙ্গে তার

কথোপকথন ভাবতে ভাবতে নির্ঝরের মনে হল, ওরা ভয় পেয়েছে। ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়ে যেতে পারে ওরা ভাবতে পারেনি।

রবি মণ্ডল ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, আসছি। তোমার কাকিমাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।

ঠিক আছে—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় নির্ঝর। বাগানে ভারি সুন্দর এক প্রজাপতি ফোটা গোলাপের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বাগান করার সময় কখন পান আপনি—জিজ্ঞেস করেছিল নির্ঝর।

ঝিরঝির হেসে রবি বলেছিলেন, সময়? ভালোবাসা থাকলে সব কিছুর জন্যেই ঠিক সময় বেরিয়ে যায়।

বছর সত্তর বয়েস রবির। সুজনডাঙার প্রায় গোড়ার দিনগুলো থেকেই রাজনীতি করছেন। বেশ কয়েকবার জেলে গেছেন। দু-দুবার খুন হতে হতেও হাসপাতাল থেকে বেঁচে ফিরেছেন। পেশায় শিক্ষক ছিলেন। যাট-সত্তরের দশকে দু-তিনবার সাসপেন্ড হয়েছেন, বরখাস্ত হয়েছেন, আবার ফিরে পেয়েছেন স্কুলের চাকরি। মানুষটির সততা আদর্শ নিষ্ঠা তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীরাও প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন। যদিও গত দশ বছর ধরে ক্রমাগত তাঁর নিজের দলের ভেতরেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, দলের ভেতরের সুবিধাবাদী দুর্নীতিপরায়ণ ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ তাঁকেই তাঁদের পয়লা নম্বর শত্রু মনে করেন। তাঁর বিরুদ্ধে দলের ভিতরে বাইরে প্রচার চলে—উনি লোক ভালো তবে বড্ড কট্টর, বাস্তববাদী নন। ওইসব ভালো লোক দিয়ে কি আজকাল রাজনীতি হয়?

ভোলার ব্যাপারে যাতায়াত করতে করতে ক্রমাগত আলাপ-আলোচনা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবাদে নির্ঝর মানুষটির গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছে। শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে তার। একমাত্র ছেলে ডাক্তার। সুন্দরবন অঞ্চলে কোনো প্রত্যন্ত গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পোস্টেড। নির্ঝর শুনেছে ছেলে চেয়েছিল বাবা তাঁর প্রভাব খাটিয়ে কলকাতার কাছাকাছি নিয়ে আসুক তাকে। চাইলে রবির পক্ষে সেটা খুব কঠিন কাজও নয়। কিন্তু ছেলের আবদার তিনি এককুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দুটি কথা—যা হবে সরকারি নিয়মমতো হবে। আমার ছেলে বলে তুমি আলাদা সুবিধা পাবে কেন? আর দ্বিতীয় কথাটি হল—সবাই পালিয়ে আসতে চাইলে গ্রামের মানুষজনের কী হবে? যাঁদের ট্যাক্সের টাকায় তুমি আজ ডাক্তার হয়েছো, তাঁদের প্রতি কোনো কর্তব্য নেই তোমার?

বাবার এসব যুক্তি মোটেই প্রসন্ন মনে মেনে নেয়নি ছেলে। গভীর অভিমানে সে সুজনডাঙার বাড়িতে আসা খুবই কমিয়ে দিয়েছে। তবু তার যুক্তি থেকে একচুলও নড়েননি রবি।

একদিন কথায় কথায় হালকাভাবে জিজ্ঞেস করেছিল নির্ঝর, একটা মানুষ যদি সারাজীবন ধরে দলের জন্য অনেক ত্যাগ পরিশ্রম করার পর শেষ জীবনে তার বা তার

পরিবারের জন্য কিছু চায়, সেটা কি অন্যায়? ভালো বেঁচে থাকার জন্যেই তো আপনাদের লড়াই?

রবি হেসে বলেছিলেন, ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই নিশ্চয়, কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি কথা আছে—সেটা হল সমাজের দেশের সবাই মিলে ভালোভাবে বেঁচে আছি কিনা, একা বা দলের কয়েকজনের ভালোর জন্যে লড়াই নয়। আর একদা তুমি ত্যাগ করেছ বলে এখন কিছু সুবিধার মূল্যে সেটা শোধ করে নিতে চাইলে সেটা কি আর ত্যাগ রইল? সেটা তো একধরনের বাণিজ্য হয়ে গেল, নয় কি?

চা খাও—দু'হাতে দু'কাপ লিকার চা নিয়ে এসে ডাক দেন রবি।

আপনি আবার—

আরে খাও, এসময়ে রোজই তো খাই আমি। চুমুক দিয়ে দেখ তো চিনি ঠিক আছে কি না?

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে মাথা নাড়ে নির্ঝর, ঠিক আছে।

বল, তারপর সাক্ষী পেলে কাউকে?

রবির ধারণা যেভাবে নানা দিক থেকে চাপ আসছে, তাতে নেপু ও তার শাগরেদরা বেশিদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে না। পুলিশ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ধরবেই ওদের। এ ব্যাপারেও রবি নিশ্চিত যে ভোলা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে জল এতদূর গড়িয়ে যাওয়ার আগেই ছেড়ে দিত ওকে। তা, নেপু ধরা পড়ার পর কোর্টে কেস উঠলে তখনই সাক্ষীর প্রশ্ন, হুমকিপর্ব ও গৌরীকে হেনস্থার পর্বের সাক্ষী রবি ও নির্ঝর। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়, এতে কি প্রমাণ করা যাবে ভোলাকে খুন করে লাশ গায়েব করেছে ওরা, তখন আইনের ফাঁক গলে অল্পমেয়াদের সাজা পেয়ে বেরিয়ে আসবে এরা। তাই রবি নির্ঝরকে বলেছিলেন খোঁজখবর করতে, যদি কোনো সূত্রে সেদিন রাতে ভোলার ব্যাপারে কেউ কিছু ঘটতে দেখে থাকে।

কিছু ঘটনা জানা গেছে, তবে কেউই সাক্ষী হয়ে বা পুলিশের কাছে সরাসরি কিছু বলতে রাজি নয়—বিষণ্ণ মুখে জানায় নির্ঝর।

কী ঘটনা?

পুরনো বাজারে রাস্তার ধারে সকালে সবজি বেচে রাজু নামে একটা ছেলে। রেলবস্তিতেই থাকে, ভোলার কয়েক ঘর পরে। সে দেখেছে।

কী?

যেদিন রাতে ভোলা নিখোঁজ হল, ঝিরঝির বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ফাঁকা। দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মের ধারে মডার্ন সেলুনের পাশে একটা হোটেল আছে না?

হ্যাঁ, ওই যে—সমীরের ভাতের হোটেল।

হ্যাঁ, কলকাতা থেকে মাল নিয়ে ফিরে হোটেলে রুটির খোঁজে ঢুকেছিল রাজু। একটু

দেরি হবে শুনে বেরিয়ে ওর নজরে পড়ে প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ির এককোণে বসে আছে ভোলা। ও এগিয়ে যেতেই ভোলা ওর কাছে বিড়ি চায়।

বেশ, তারপর?

রাজুর কাছে বিড়ি ছিল না। ও বলে, দাঁড়াও কিনে আনি, আমারও লাগবে। ফিরে এসে দেখে ভোলা নেই।

এটুকু? আর কিছু নয়?

না, আছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে রাস্তার ওপারে ভোলা একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটছে। হঠাৎ পেছন থেকে খুব দ্রুত একটা মারুতি ভ্যান এসে ওদের পাশে দাঁড়ায়। কথা বলতে থাকা লোকটা ভোলার মুখে কিছু গুঁজে দেয়। ভ্যান থেকে দু'জন লাফিয়ে নেমে খুব তাড়াতাড়ি ওকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলে নেয়। ঝড়ের মতো চলে যায় গাড়ি।

কত রাত তখন?

এগারোটা বেজে গেছে।

দোকান-পাট—

সমীরের হোটেল ছাড়া প্রায় সবই বন্ধ। বৃষ্টিতে রাস্তায় কোনো লোক ছিল না।

রাজু চিনেছে কাউকে?

হ্যাঁ।

কে?

সবাইকেই চেনে রাজু। সব নেপুর দলবল। লখা, গণেশ, চিতু—এইসব নাম তাদের।

সব নাম-টাম বলল তোমায় রাজু?

এজন্য চার-পাঁচ দিন ওর পেছনে লেগে থাকতে হয়েছে। কাউকে বলতে পারব না এই শর্তে মুখ খুলেছে ও।

রাজু যে দেখেছে, এ খবর তোমায় কে দিল?

রাজু সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে ওর মাকে জানিয়েছিল ব্যাপারটা। সে-ই কদিন আগে মুখ ফসকে গৌরীর কাছে বলে ফেলেছিল।

আর কে কে জানে?

আর কেউ না। আমি, গৌরী আর এই আপনি জানলেন। কেন?

না, রাজু বেচারির সিকিউরিটির ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হয়। ওরা যদি টের পায় সাক্ষী হওয়ার—

না, না, ও সাক্ষী দেবে না।

এই এক মুশকিল। সাক্ষীর অভাবে কত ক্রিমিনাল যে ছাড়া পেয়ে যায় এ দেশে! তাহলে রবি কাকা, কী হবে এখন? আমাদের এত দৌড়ঝাঁপ, নিট ফল জিরো!

না, ঠিক তা বলা যায় না।

কেন নয়, বলুন?

ফল কি একেবারেই কিছু নেই!

আমার তো তাই মনে হয়।

দেখো, হাতকাটা খোকন বা নেপুরা কোণঠাসা হয়েছে। ওদের মদতদাতারা খানিকটা পিছু হটেছে। ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা চট করে ঘটাতে সাহস পাবে না ওরা।

সে ধরুন—দু-এক বছর চুপচাপ থাকবে, আবার শুরু করবে। ওরা জানে এসব করে ওদের শাস্তি হবে না। তাছাড়া এক হাতকাটা খোকনের জায়গায় নতুন কোনো নাককাটা কি পা কাটা তৈরি হবে, তারা করবে এসব।

এই সিস্টেমে এ সমস্যা তো থাকবেই!

সিস্টেম?

হ্যাঁ, সামাজিক অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থায় আমরা বাস করছি।

আপনিও সেই একই কথা—

কেন, ভুল হল?

যে প্রশ্ন রবি মণ্ডলকে করবে বলে সে মাঝে মাঝেই ভাবে, সে প্রশ্ন আজ এই আলোচনার মাঝে অনিবার্যভাবেই উত্থাপিত হওয়ার অবস্থায় এসে গেল। নির্ঝর হাসে আপনমনে, বিড়বিড় করে, তার সংশয়াচ্ছন্ন মুখের ছায়ায় যেন কত রকমের বৃষ্টি-অবৃষ্টি খেলা করে যায়।

রবি একটু অবাক হন। এই মুহূর্তে ছেলেটিকে কেমন যেন অন্যরকম বোধ হয়। কেমন এক খ্যাপাটে পাগলাটে গোছের। গলা নামিয়ে স্নেহের সুরে বলে, কী ব্যাপার? তুমি কি কিছু বলছ আমায়?

আচ্ছা কাকা, একটা কথা বলি?

বল, নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে।

আপনার মতো অনেকেই ওই ব্যবস্থার কথা তোলেন আর সব কথা যেন ওখানেই শেষ হয়ে যায়।

মানে?

ব্যবস্থা যেন এক নিয়তি। যেন এক ভাগ্যদেবতার মতো। সব ব্যাপারে ব্যবস্থার দোহাই দিলে মানুষের ভূমিকা কী? মানুষ কি কেবল ব্যবস্থার নাটবল্টু?

দেখো, কে কীভাবে ব্যবস্থার কথা বলে জানি না, আমি ব্যবস্থার কথা তুলি সেটা পাল্টানোর কথা বলতে, অসুখের কারণ না জানলে—

বুঝেছি, কিন্তু অসুখের কারণ কি শুধু ব্যবস্থা, মানে শুধু উৎপাদনকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা, আর কিছু নয়?

না, তা ঠিক নয়, প্রধান কারণ আর্থিক ব্যবস্থা হলেও অন্য অনেক কারণও থাকে। যেমন সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক—কিন্তু এই আর্থিক ব্যবস্থাই মূল বলে মনে করি।

মানুষ, ব্যক্তিমানুষের চেতনা? ইতিহাসের পালাবদলে ব্যক্তিমানুষের চৈতন্যের ভূমিকা কি খুব গৌণ? আপনি আন্তোনিও গ্রামশির লেখা পড়েছেন?

গ্রামশি? না, সেভাবে পড়িনি কিছু। মৃদু হেসে রবি বলেন, মানবচেতনা কি স্বয়ম্ভূ, নাকি কোনো দূর আকাশের অমৃতলোক থেকে আসে?

চেতনার মূলটা অমৃতলোক থেকে আসে কি না, এ ব্যাপারে অবশ্য আপনার মতো পুরোপুরি নাকচ করে দিতে সংশয় আছে আমার—কারণ আমরা সকলেই প্রকৃতির সন্তান, আর ওই অমৃতলোক বলতে কী বোঝাচ্ছেন জানি না। তবে তা যদি মহাবিশ্ব বা বিশ্ব প্রকৃতি হয়, মানবচেতনার সঙ্গে তার যোগ থাকা অসম্ভব কিছু নয়! তবে সমাজের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতেই ব্যক্তিচৈতন্য পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে, তার জীবনধারা পরিশ্রম মননচর্চা—

দাঁড়াও বাপু, তুমি যে একেবারে গম্ভীর তত্ত্ব আলোচনা জুড়ে দিলে! ভালো, এমন কথা আলোচনার লোকও আজকাল ধারেকাছে বিশেষ দেখি না! তবে তুমি গোড়ায় গলদ করে ফেলেছ!

মানে?

মানে—বিশ্বপ্রকৃতিতে তুমি চৈতন্য পেলে কোথায়? সে জগৎটা তো জড়জগৎ—

আপনার কথা মেনেই বলি, আপনার মতে বস্তু থেকে চেতনা, তা সে বস্তু কি মহাবিশ্ব বা বিশ্বপ্রকৃতির বাইরে?

তা নয়, তবে—

আর মানবচেতনা ছাড়া বস্তুজগতের অস্তিত্বই বা কী করে বুঝবেন আপনি?

মানবচেতনা ছাড়া বস্তুজগতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই বলছ! তোমার চেতনা লোপ পেলে কি এই বিশ্বটাও অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে?

এ বিষয়ে আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ বিতর্কের কথা নিশ্চয় জানেন আপনি! আমার চেতনা লোপ পেলেও বিশ্বজগৎ যে আছে এটাও কোনো না কোনো মানুষের চেতনায় ধরা পড়ছে—মানবচেতনাহীন জগতে বিশ্বপৃথিবী আছে কী নেই তা নিয়ে কে ভাবতে যাবে বলুন তো? আর সামান্য যেটুকু জানি—হাইজেনবার্গ মশাইয়ের অনিশ্চয়তা বিধি অনুযায়ী দ্রষ্টা ছাড়া বস্তুকণিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না—

আইনস্টাইন মশাই যে হাইজেনবার্গের তত্ত্ব মেনে নিতে পারেননি, সেটাও নিশ্চয় জান। আর এও বোধহয় জান, আমাদের এই দৃশ্যমান বাস্তব জগতে ও তত্ত্ব প্রমাণিত নয়!

আচ্ছা কাকা, আপনি কি মনে করেন, পৃথিবী সম্পর্কে মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানবজীবন বা সমাজ সম্পর্কে সব ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে? কোনো প্রশ্ন নেই? সংশয় নেই? অনিশ্চয়তা নেই? সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেছে মানবসমাজ?

তা কী করে সম্ভব? একমাত্র মূর্খরাই নিজেদের পরম জ্ঞানী ভাবে! কিন্তু এটাও হয় ওটাও হয় সেটাও হয় বলে একটা ধোঁয়াশার মধ্যে দিয়ে কি চলা যায়? সব কিছুর একটা যুক্তিনির্ভর—

যুক্তির তল পান আপনি?

মানে?

যুক্তির গোড়ায় আপনি একটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই যুক্তিদৌড় শুরু করেন, না?

কীরকম?

জড়বস্তু থেকেই চেতনার উৎপত্তি, এভাবেই মানবচেতনার ব্যাখ্যা করেন অথচ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা মহাপৃথিবীর সন্তান এই মানব সেই মহাপৃথিবীতে কোথাও কোনওভাবে মহাচৈতন্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে —এ চিন্তা যুক্তিহীন মনে হয় আপনাদের, এমনকি কোনো সংশয়ও নেই!

মহাচৈতন্য! ঈশ্বরের কথা বলছ?

কেউ যদি তাকে ঈশ্বর ভাবেন সেটা তাঁর ব্যাপার। আমি মহাচৈতন্যই বলছি এবং তার অস্তিত্ব আছেই, তা আমি জোর দিয়ে বলছি না, ধ্রুব সত্য মনে করছি না, শুধু সংশয়—এক ধূসর এলাকার কথা বলছি, থাকতে পারে আবার নাও পারে!

গেট খুলে সাইকেলে হেলান দিয়ে একটি লোক মুখ বাড়িয়ে রবিকে ডাকে দু-তিনবার। চিন্তামগ্ন রবি ঘাড় ঘুরিয়ে হাত ইশারায় জানান, এখন নয়। লোকটি মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়। ঘর থেকে একটা ছোটো বেড়াল ছুটে এসে রবির কোলে চড়ে বসে। আদর করতে করতে একফাঁকে ঘড়ি দেখেন রবি।

নির্ঝর বলে, আজেবাজে কথায় অনেকটা সময় নষ্ট করলাম, তাহলে—

ওঠার উপক্রম করতেই রবি বলেন, আরে বোসো, কিছু সময় নষ্ট হয়নি, বরং জং-পড়া মগজে অনেকদিন পরে একটু ঘা পড়ল! দেখ বাপু, আমাদের এই আলোচনায় আমি এটুকু বুঝলাম তুমি সর্বক্ষেত্রেই প্রশ্ন সংশয় রাখতে চাইছ। কিন্তু জীবনে সবক্ষেত্রে সংশয় কি কাজের কথা? তোমার খিদেটা তো সত্য? না কি সে নিয়েও সংশয়?

খিদে নিয়ে কেন, বহু ব্যাপারেই আমি নিঃসংশয়! কিন্তু শুধু কতগুলো মোটা দাগের কাজের কথা নিয়েই তো মানুষ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। তাহলে বোধহয় আজও অরণ্যে আদিম জগতে আর দশটা জানোয়ারের মতোই বাস করত মানুষ! মানুষের কাছে আজও অনেক কিছুই রহস্যময়—তার জন্ম-মৃত্যু—এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি—

কথা শেষ করে না নির্ঝর। বাইরে ফুলবাগানে রোদের লুটোপুটির দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকে। কী একটা সুর যেন তার বুকের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত? শুধু সুর, কথা মনে পড়ে না।

রবিও চুপ। হালকা মেঘের আস্তরণ আকাশে। রোদের তেজ কমে আসে। দূরে কোথাও বাচ্চার কান্না। তা ছাপিয়ে ভেসে আসছিল পাখির ডাক।

ফোন বাজে। বেড়ালটা লাফ দিয়ে নামে কোল থেকে। রবি উঠতে না উঠতেই তিনবার রিং হয়ে থেমে যায়। বেড়ালটা ফের কোলে চড়ে বসে।

আচ্ছা, সোদ্দা কথায় এসো তো বাপু, কী বলতে চাও? মানবচেতনা কি সমাজ অর্থব্যবস্থা নিরপেক্ষ একটা ব্যাপার? ইতিহাসের ভাঙা-গড়া কি কিছু উন্নত চেতনায় ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ফসল- -যে চেতনা তারা কোনো অমৃতলোক থেকে পেয়েছেন! বলতে বলতে রবির চোখে-মুখে হালকা বিদ্রূপের হাসি ছড়িয়ে যায়।

আমি মোটেই সেকথা বলিনি। সোদ্দা কথা বলে কি কিছু হয়? তাহলে পৃথিবীতে এত জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রশ্ন-উত্তরের কোনো প্রয়োজন হত না। এককথায় সব সেরে দেওয়া যেত। মানবচেতনা সমাজব্যবস্থা নিরপেক্ষ কিছু নয় তা আমি মানি। মানুষের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে উন্নততর মানবিক পৃথিবীর দিকে যাত্রা করতে, এমনকি সেই সীমাবদ্ধতার স্বরূপকে বুঝতেও মানবচেতনার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কোনো অর্থনৈতিক বিবর্তনবাদ বা তথ্যরাশি নয়, এরকমই মনে হয় আমার।

অর্থনৈতিক তথ্যরাশি কি মানবচেতনার বাইরে?

আমরা বোধহয় ঠিক কেউ কাউকে বুঝতে পারছি না। কাকা, ব্যবস্থার দোহাই দিয়ে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে মানুষ? জীবনের কি কোনো ছক হয়? তত্ত্বের ছকে কীভাবে ব্যাখা করা যাবে চলমান জীবনের? মানুষের সৃজন ক্ষমতাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় কি? তথা তত্ত্বকে প্রতিমুহূর্তে চলমান জীবনের সাপেক্ষে যাচাই করে নেবে না মানুষ? নাকি অন্ধের মতো অনুসরণ করে যাবে? যদি যাচাই করতে হয় তাহলে মানুষই তো প্রধান গুরুত্বের জায়গায় এসে গেল, তাই নয় কি?

কোন্ মানুষ? কেমন তার জীবনধারা? তার জীবনধারার প্রভাব কি পড়ে না তার চেতনায়?

হ্যাঁ, বলতে পারেন, জীবনধারা ও চেতনার একটা দ্বন্দ্ব—

এই দ্বন্দ্বের কথা এতক্ষণ বললে তুমি। জীবন থেকে তত্ত্ব আবার তত্ত্ব ও জীবনের দ্বন্দ্বে নতুন তত্ত্ব ও নতুন জীবন—কিন্তু 'মানুষ' বলে একটা সামগ্রিক ব্যাপার—জীবনধারার স্তরভেদহীন একটা বিষয়কে বুঝতে চাইলেও মুশকিল—তবে হ্যাঁ, জীবন ও তত্ত্বের দ্বন্দ্ব বা মিলিয়ে দেখার ক্ষেত্রে প্রশ্ন ও সংশয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একথা মানতেই হয়।

কিন্তু ব্যবস্থার নামে একটা তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে জীবনের রহস্যময়তাকে অস্বীকার করে জীবনকে অনড় ভেবে নিয়ে মানুষের চেতনার ভূমিকাকে ছোটো করে দেওয়া—

প্রশ্নহীন সংশয়হীন একধরনের অন্ধতা—কেমন যেন এক নতুন ধর্মের মতো ঈশ্বরবিশ্বাসের মতো মানুষের পথ রোধ করে দাঁড়ায়!

আসলে কী জান, ভারসাম্য বলে একটা কথা আছে। কেউ চেতনাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সমাজ-অর্থনীতি-উৎপাদন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে বসে, আবার উল্টোটাও ঘটে। আবার প্রশ্ন ও সংশয়কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সব কিছু গুলিয়ে দেয়— পেটে খাবার না থাকলে যে শেষপর্যন্ত চেতনা লোপ পায়, ওতেও তারা সংশয় জানাতে থাকে! কিংবা সংশয়বাদী হয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না দিয়ে যা আছে যেভাবে আছে তাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে—এ দিকগুলোও ভাবার আছে, নয় কি?

ভাবনার কোনো পথ খোলা রাখতে আমার কোনো আপত্তি নেই। এতক্ষণে নিশ্চয় এটুকু টের পেয়েছেন?

আর মানুষ বলতে অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদহীন একটা প্রজাতিকে সর্বদা বিবেচনায় আনাও বোধহয় ঠিক নয়, নাকি?

নিশ্চয় নয়, তবে মানুষের শ্রেণীভেদের এক এবং অদ্বিতীয় মাত্রা সবসময় অর্থনীতিই নয়, এটাও মানেন নিশ্চয়?

একমাত্র না হলেও প্রধান মাত্রা তো বটে!

বড়ো জটিল লাগে এসব চিন্তা—কোনো অবস্থায় যেটা প্রধান অন্য অবস্থায় সেটাই অপ্রধান—বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে দাঁতে নখ কাটছিল নির্ঝর।

অর্থনৈতিক শ্রেণীবদ্ধ নানা মানবগোষ্ঠীর টানাপোড়েনই তো ইতিহাসের ভাঙা-গড়ায় প্রধান ভূমিকা নেয়, তাই তো? প্রধান বলছি, একমাত্র বলছি না।

গন্তব্য জানে কি মানুষ? পথও কি তার জানা হয়ে গেছে? বলতে বলতে কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ে নির্ঝরের।

গন্তব্যের খানিকটা দেখতে পায় সে, খানিকটা তার স্বপ্নে, কল্পনায়। প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটার মতো একটা পৃথিবী গড়ার প্রাথমিক গন্তব্য তার।

আর পথ?

পথ জটিল, রহস্যময়, তবু পথ খুঁজে পেতে, পথের দিশা পেতে ইতিহাসের ভাঙা-গড়ার চালিকাশক্তির সন্ধান করতেই হয় তাকে। রবি থেমে থেমে খুব স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন।

পথ খোঁজার গন্তব্য জানার আলোছায়াময় রহস্যের ভেতরই হাঁটতে থাকে—থাকবে মানুষ—এক গন্তব্যে পৌঁছে নতুন গন্তব্যের স্বপ্ন খোঁজা রহস্যময়তা—সংশয় থাকবে প্রশ্ন থাকবে অতৃপ্তি থাকবে।

হয়তো তাই। তবু পথ খোঁজা গন্তব্য জানার চেষ্টাটা মিথ্যে হয়ে যায় না। মানুষ শুধু ভাবুক নয়, কর্মীও।

মানুষ শুধু কর্মী নয়, ভাবুকও।

একসঙ্গে দুজনের প্রাণখোলা হাসি। বেড়ালটা রবির কোল থেকে বেরিয়ে দৌড় দেয় ঘরে। গেট খুলে তিনটি অল্পবয়েসী ছেলে ঢোকে। বলে, দাদু, পরানকাকার মা মারা গেছেন—

কখন?

একটু আগে।

যাচ্ছি।

খুব গোলমাল হচ্ছে—

তিন ছেলের?

হ্যাঁ। পরানকাকা বললেন—

বুঝেছি, যাচ্ছি।

ছেলে তিনটি চলে যেতেই, উঠলেন রবি। নির্ঝরও উঠে দাঁড়ায়। রবি বলেন, জমি-বাড়ি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। মা মরেছে আধঘণ্টাও হয়নি বোধহয়! আচ্ছা শোনো, রাজুর ব্যাপারটা পাঁচকান না হয় দেখো। আর আমি ভাবছি গভর্মেন্ট প্লিডার একজন আমার ঘনিষ্ঠ, তার সঙ্গে পরে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব। আরেকটা কথা—তোমায় কেউ কোনো হুমকি-টুমকি—

পরে বলব, ব্যস্ত আছেন এখন।

একমুহূর্ত থমকে যান রবি। তারপর বলেন, বুঝেছি, পরেই শুনব, কিন্তু সাবধানে থেকো।

ম্লান হাসে নির্ঝর। গ্রিলের দরজা খোলে। পায়ে চটি গলায়।

## চোদ্দ

আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমে, যখন বৃষ্টি নামল—গানের কলিটা সকাল থেকেই বাতাসে যেন ঘুরে ঘুরে ভেসে আসছে। প্রথমে গুনগুন করে, তারপর একটু গলা ছেড়ে গেয়ে ফেলে সুরমা।

দুপুর এলেই, স্নান-খাওয়ার পর বড়ো বিরক্ত বোধ করে সুরমা। সকাল ছটায় ওঠার পর থেকে দুপুর পর্যন্ত সংসারের নানা কাজে, তদারকিতে ব্যস্ত থাকতে পারে। প্রশান্তর যেদিন অফিস থাকে, সেদিন সকালের প্রথম তিন ঘণ্টায় বেশ ব্যস্ততা। প্রশান্তর জামাকাপড় থেকে অফিসের ব্যাগ পর্যন্ত সবই সে-ই গুছিয়ে-গাছিয়ে দেয়। এমনকি মানিব্যাগে টাকা-পয়সা কত কী আছে, সেসবও দেখেশুনে দেয় সে। তারপর বুবুনের

স্কুলের যাওয়ার তদারকি, স্নান-খাওয়া, স্কুল ড্রেস, বই-ডায়েরি সব ঠিকঠাক দেখে দেওয়া। ওরা চলে গেলে, শ্বশুরের দিকে একটু মনোযোগী হওয়া, রান্নাঘর, ঘরদোর সাফসুতরো রাখা, দেওয়াল আলমারি মোছা কী ঝুল ঝাড়া দিয়ে এক একটা ঘর এক-একদিন পরিষ্কার রাখা। এ বাড়িতে ঘর তো কম নয়! বেশ বড়ো বড়ো ঘর। যা জায়গা তাতে এখনকার দিনের দু-তিনটে ফ্ল্যাট অনায়াসেই হয়ে যেতে পারে।

স্নান-খাওয়া সারতে বেলা দুটো গড়িয়ে যায়। তারপরই মুশকিল। বই, ম্যাগাজিন নিয়ে বসে কিন্তু তবুও ওই অবসরে ছাপা অক্ষর উপেক্ষা করে ছাপিয়ে মন অন্য কোথাও চলে যায়। কোথায়? সে কি ঠিকঠাক জানে সুরমা? বাড়ির পরিসর বড়ো ছোটো মনে হয় তখন। ছাপা অক্ষর কিংবা কোনো কোনো দিন টিভির পর্দায় নানা কথা বা নানা মানুষের চলাফেরা কেমন প্রাণহীন ইট-সিমেন্ট চাপা পড়া—একরাশ বিষণ্ণতা যেন ধোঁয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। তখন এই বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও ছুটে যেতে ইচ্ছে করে তার। আর—মনে হয়, জীবন্ত মানুষ, যে মানুষের সঙ্গে নিতান্ত কেজো কথা বাদ দিয়ে প্রাণভরে অকাজের কথা বলা যায়, এমন মানুষ যদি পাওয়া যায়, সে নারীই হোক কিংবা পুরুষ।

নির্ঝর অনেকদিন হয়ে গেল আসেনি। ভেবেছিল ফোন করবে। কিন্তু পারেনি। সঙ্কোচ হল, ওর বাড়ির লোক—মাসিমা, কমলেশকাকা এরা আবার কী ভাবে না ভাবে! ভোলা নিখোঁজ হওয়া নিয়ে নির্ঝরের নানা জায়গায় ছোটাছুটি কাজকর্ম কানে এসেছে তার। সুরমার মনে হয়েছিল এসময় সেও যদি দাঁড়াতে পারত নির্ঝরের পাশে।

নির্ঝরকে দেখার তাড়না তার মনকে এমন পেঁচিয়ে ধরল যে একদিন বিকেলে ওদের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়েও পড়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি—সেই একই চিন্তা, কেউ যদি ভাবে কিছু! আসলে প্রশান্তর সঙ্গে দু-একবার ও-বাড়ি গেলেও একা কোনোদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। মল্লিকা কয়েকবার অবশ্য বলেছেন, সেই ছুতোয় যাওয়া যেতে পারত, কিন্তু নিজেকে কেমন একটু হ্যাংলা মনে হল। আসলে সে নিজে জানে বাড়িতে মল্লিকার খবর নিতে যাওয়াটা একটা ছুতো বৈ কিছু নয়, আর নির্ঝরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সেও হয়তো বুঝতে পারবে সুরমা হঠাৎ কেন চলে এল—নির্ঝরের কাছে এভাবে ধরা পড়তে চায় না সুরমা। সুরমা শুনেছে একসময় যখন ওর শ্বশুরমশাই সুস্থ ছিলেন, তখন দুই বাড়ির একটা যাতায়াত, ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, সবই ছিল, কিন্তু সে সব অতীত। কমলেশ বছরে এক-দুবার বিজয়ার পর কী এদিকে অন্য কোথাও এসে ফেরার পথে টুঁ মেরে যান। বছরে একবার লাইব্রেরির অনুষ্ঠানে আসেন অবশ্য। নির্ঝর আসে, তবে তার এই আসা-যাওয়া দুই বাড়ির কেউই সেভাবে জানে না। প্রশান্তকে যেচে বলে না সুরমা। বুবুন মারফত দু-একদিন শুনেছে প্রশান্ত, হালকাভাবে বলেছে, হঠাৎ এ বাড়িতে কী ব্যাপার? বাউণ্ডুলেটা করছে কী আজকাল? টাকা-পয়সা চায়নি তো?

শুনে সুরমার খারাপ লাগলেও প্রকাশ করেনি। অন্যরকম মানে হতে পারে তার। চুপ করে থেকেছে। বোবার মনের গতি কে আর বোঝে? তাছাড়া প্রশান্তর সঙ্গে দু-চারটে সাংসারিক কাজের কথা ছাড়া সেরকম কী কথাই বা হয়, বলতে গিয়ে দেখেছে মেলে না। সকলের মনেই বোধহয় সূক্ষ্ম তার থাকে কয়েকটা, কথায় কথায় তা যদি বেজে না ওঠে, সে বেজে ওঠা সুরে হোক বা বেসুরে সেকথা অন্য, কিন্তু যদি বেজে না ওঠে, তখন যেন কথা আর এগোয় না, কথোপকথন একটা ভার হয়ে দাঁড়ায়! সূক্ষ্ম তার কি সব মনেই থাকে? কে জানে, হয়তো থাকে, প্রশান্তর মতো খুব কেজো হিসেবি মানুষের মনে থাকে কী? কেন? যখন প্রশান্ত টিভির পর্দায় ফুটবল কী ক্রিকেট দেখে, একটা পাস, একটা গোল কি ক্রিকেটে একটা স্কোয়ার কাট দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তখন তার মুখের রেখাগুলোও যেন বদলে যায়। তখন তার মনেও হয়তো তারে তারে কাঁপন লেগে সুর ধরে অথচ সুরমা ছুঁতে পারে না সেই সুর।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে এসব ভাবতে ভাবতে পাশে খোলা খাতার দিকে একবার শূন্য চোখে তাকায় সুরমা। নির্ঝর তাকে লিখতে বলেছিল, গত তিন-চার দিন সে চেষ্টাই করছে। লেখা সাত-আট লাইনের বেশি এগোয়নি, তবু লাভ একটা হয়েছে। দুপুরগুলো যেন বদলে গেছে। কতদিন পরে আজ সারাদিন মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠেছে গান। অবশ্য সমস্যাও বেড়েছে একটা। বারেবারে নির্ঝরের কথা মনে পড়ছে। তাকে দেখবার, তার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছেও আগের থেকে আরও প্রবল হয়ে উঠছে।

নির্ঝর, নিরুবাবু, আমি তোমার প্রেমে পড়েছি! নিজের কাছে ফিসফিস করে হলেও স্পষ্ট একথা উচ্চারণ করতে পারে সুরমা।

কথাটা কি ঠিক হল? মানে, ঠিকভাবে বলা হল? আমি তো ওর প্রেমে অনেক আগেই পড়েছি। ভালো লাগা, ওকে দেখলে ওর সঙ্গে কথা বললে মনে একটা খুশির ঢেউ, কখনও বা তীব্র বিষণ্ণতা, মমতা, টান—এসবই তো ছিল। কিন্তু ক্রমশ 'সম্পর্ক' যেন নিছক বন্ধুত্বের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে চাইছে।

আচ্ছা, যে কোনো দুটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সম্পর্ক বন্ধুত্বই হওয়া উচিত, নাকি? অফিসে বা বাইরে নানারকমের কেজো সম্পর্কের মধ্যে হয়তো তা হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। অফিসে বস্ থাকে, সাব-অর্ডিনেট স্টাফ থাকে, ব্যবসায়ীর মহাজন থাকে, কিন্তু এসবের বাইরে? পরিবারে? বাবা-ছেলে, মেয়ে-বাবা, মা-ছেলে কী ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কগুলো শুধুমাত্র বন্ধুত্বই হওয়া উচিত, অথচ হয় না। সেখানেও নানা প্রয়োজন, আধিপত্যের খেলা, ছোটো ছোটো ক্ষমতার কত বিচিত্র কাটাকুটি সেসব সম্পর্কের আগাপাস্তলা জড়িয়ে থাকে—এসব কথা নির্ঝরই বলেছিল, মনে পড়ে সুরমার।

কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক দুটি নারী-পুরুষের বন্ধুত্বের ভেতর যদি শরীর এসে যায়, যদি যৌনতার

বৃষ্টিধারায় দুটি শরীর যদি তীব্র স্নানের আরামে মেতে উঠতে চায়, সেও কি বন্ধুত্ব শুধু? সে কি বন্ধুত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল?

কে টেনেছে গণ্ডি? কোন্ মোড়ল? যৌনতা কি শুধু শরীরের প্রয়োজনেই? প্রশান্তর সঙ্গে বন্ধুত্ব না হয়েও যে যৌনতা তা কি কেবল কেজো, নিতান্ত অভ্যাস, প্রয়োজনের দাসত্ব, প্রবৃত্তির দাসত্ব—সুরমার এই ভাবনার ভেতরে কি নির্ঝরের প্রভাব? সুরমা ভাবে, তা কি এক আধিপত্য? তা কেন? হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যা গ্রহণ করতে পারে সে, যা তার মনের সূক্ষ্ম তারে তারে কাঁপন জাগায় তাকে আধিপত্য বলবে কেন সে? দুটো মানুষ কি মিলতে পারবে না চিন্তায়? একজনের ভাবনা অন্যজন গ্রহণ করলেই কি আধিপত্য হয়? আধিপত্য তখনই, যদি সে ভাবনায় ভাবনার নিজস্ব জোরের বাইরে সমাজ সংসারের অন্য কোনো জোর কাজ করে, তাই না?

কিন্তু নির্ঝরের দিক থেকে কি একই অনুভূতি? সে অনুভূতির প্রাবল্য কি একই রকম? সে আভাস দেয়, ইঙ্গিত দেয়—এমনই মনে হয় সুরমার। কিন্তু সাহস করে কোনোদিন গণ্ডি ভাঙেনি তো, নাকি সবই একতরফা? সুরমার দিক থেকেই তীব্র আকুলতা!

নিজেকে নিজের আয়নায় দেখতে দেখতে কি লজ্জা অনুভব করে সুরমা? নিজেকে খুব নির্লজ্জ মনে হয় কি তার? যে পরিবেশে পরিবারে সে মানুষ, বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে পাওয়া আজন্মলালিত সংস্কার কি তাকে কোথাও গোপনে আঘাত করে যায়? তা নয়তো লজ্জা পাবে কেন সে?

চিত হয়ে শোয় সুরমা। সংস্কার ছাড়া একে কী ভাবতে পারে সে? আচ্ছা, প্রশান্তও যদি এমন কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, মেনে নিতে পারবে সে?

পারবে, নিশ্চয় পারবে—ভাবতে ভাবতেই মৃদুভাবে মাথা নাড়ে সুরমা। নয়তো সে এক স্বার্থপরতা হয়ে যায় না কি? ওই যে বলে না—নিজের বেলায় আঁটিসাঁটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি!

হঠাৎ হাসি পায় সুরমার। প্রশান্ত যে কোথাও জড়িয়ে পড়েনি, এমনটাই বা সে ভেবে নিচ্ছে কেন? তার মনের খবর যেমন প্রশান্ত রাখে না, প্রশান্তর মনের খবর কি সে রাখে?

কিন্তু তবুও কোথা থেকে কে যেন ফিসফিস করে কেবল কুকথা শুনিয়ে যায়—নির্ঝরের সঙ্গে সম্পর্কের গণ্ডি ভাঙতে গিয়ে সংসারটাই ভেঙে যাবে না তো? এই বয়েসে বাউণ্ডুলে ওই পুরুষকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারবে না সে, না, সে সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই। নতুন করে সংসার পাতার কোনো ইচ্ছা সে বোধ করে না। সংসার নামক প্রতিষ্ঠানটায় তার কোনো অসুবিধা নেই তো! দিব্যি চলছে, সচ্ছলতার অভাব নেই, শাশুড়ি-ননদ-দেওর-জা ইত্যাদি নিয়ে কোনো অশান্তি নেই। পণের টাকা আদায়ে কেউ কোনো পীড়ন করছে না তাকে। বন্ধু হিসেবে না হোক স্বামী হিসেবে প্রশান্তর বিরুদ্ধে তার বলার প্রায় কিছুই নেই।

সুরমা তাই গণ্ডি ভেঙে নতুন একটা গণ্ডির কথাও ভাবতে পারে। কিন্তু নির্ঝর কি নতুন গণ্ডি মেনে চলতে পারবে? সুরমা বন্ধুত্ব চায়। যান্ত্রিক যৌনতার বাইরে খুব তীব্র হৃদয়মথিত যৌনতা চায় সে। একজন প্রেমিক পুরুষকে চায় সে। কিন্তু সেই প্রেমিক পুরুষকে নিয়ে নতুন সংসার চায় না। সংসার নামক প্রতিষ্ঠানের চাপে ধ্বস্ত করতে চায় না প্রেম-বন্ধুত্বকে। আর তাছাড়া, পুরনো সংসারের প্রতিও কি মায়া নেই তার? সংসার তো আর একা প্রশান্ত গড়ে তোলেনি, এ তো তারও নিজের হাতে নিজেকে নিয়েই গড়ে তোলা—তাছাড়া, বুবুন! বুবুনকে ধ্বস্ত করার কোনো অধিকার কি তার আছে?

কী সব ভাবছি আমি আবোল-তাবোল? বুবুনের মুখ মনে পড়তেই সুরমার বুকের ভেতর কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। কিন্তু ভাবনা থামে না, এক তরঙ্গ যায়, ছুটে আসে নতুন তরঙ্গ।

আমি কি শুধু মা? শুধু স্ত্রী? আমি কোথায়? কোথায় আমি? আমার কি ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকতে পারে না? আমার বন্ধুত্বে অনুশাসন মানবো কেন আমি? শরীর ঘিরে অনর্থক সংস্কার আর শুচিবাই মানতে গিয়ে নিজের আবেগ হৃদয়কে পিষে মারব কেন আমি? আমার সংসার সত্যি, বুবুন সত্যি, আর নির্ঝরকে জড়িয়ে ধরে এখন যে আমার লম্বা চুমু দিতে ইচ্ছে হচ্ছে সেও সত্যি। মনে হচ্ছে নির্ঝর আমায়—আমায়—

শরীরে বড়ো উত্তাপ বোধ করে সুরমা। মাথার তলা থেকে বালিশ নিয়ে জড়িয়ে ধরে পাশ ফেরে।

আচ্ছা, নির্ঝর কি ভীতু? তার প্রেমিক পুরুষটি কি আসলে পুরুষত্বহীন? গণ্ডি ভাঙে না কেন তবে? নাকি সুরমার এখনকার এই তীব্র আকুলতার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে সে?

এর আগে একদিন, সেই যে দুপুরে এল, কথায় কথায় বলেছিল, তুমি আমার কাছে ক্রমাগত একটা নেশার মতো হয়ে উঠছ—সুরমা কি একথায় সাড়া দিতে পেরেছে সেভাবে? নির্ঝর হয়তো তাই অপেক্ষা করে আছে। সেদিন সমর সেনের কবিতার কয়েকটা লাইন শুনিয়েছিল—চোখে কঠিন ইশারা, হিংস্র হাহাকারের কথা বলেছিল নির্ঝর কবিতার আড়ালে, বলেছিল চোখে নেই সমুদ্রের গভীরতা!

নেই? সমুদ্রের গভীরতা নেই? শুধুই হিংস্র হাহাকার? শরীরের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরার হাহাকার দেখলে তুমি শুধু নির্ঝর? তাই কি গণ্ডি ভাঙোনি তুমি? নীলার আভাস, সমুদ্রের গভীরতার জন্যে অপেক্ষা করে আছ? তুমি নিতান্ত নেশা করতে চাওনি আমায়, আসক্তি করতে চাওনি, সেসব ছাড়িয়ে গভীর কোনো সমুদ্রে অবগাহন করতে চেয়েছ? ভয়ংকর দুষ্টু তুমি! ভারি বদমাশ!

বুজে আসা চোখের অন্ধকারে, পাতলা ঘুমঘোরে নির্ঝরকে স্পষ্ট দেখতে পায় সুরমা। স্পষ্ট শুনতে পায় তার হা-হা হাসি। সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে নির্ঝর। ঠোঁটের কোনায়

লক্ষ্মী ছেলের মতো ঝুলে আছে হাসি। সে হাসি যেন ভারি নিষ্পাপ। সে হাসি যেন কিচ্ছু বোঝে না—তারপর কখন সেই লক্ষ্মী ছেলে হা-হা হাসি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়।

ঘরজোড়া সেই হাসি বুঝতে বুঝতে সোফায় আধশোয়া নির্ঝরের দিকে তাকাতেই কি একটু কেঁপে ওঠে সুরমা? নির্ঝর নয়, এ যেন অন্য কেউ বসে আছে। তার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় না।

কী হয়েছে তোমার?

স্বর শুনে আস্বস্ত হয় সুরমা, এ নির্ঝব, নির্ঝরই। সুরমা বলে, কী হয়েছে? কী মনে হয় তোমার?

বেশ গুছিয়ে সংসার করছ, স্বামী পুত্র সব নিয়ে, তবু কেন---আচ্ছা, তুমি কি গড়তে চাও আবার ভাঙতেও চাও?

গড়তে চেয়েছি কে বলল তোমায়? বিয়ে, সংসার, খাওয়া-ঘুম রমণ, বাত কি হাঁপানি, নাতি-নাতনি—একটা ছাঁচের ভেতর ঢুকে পড়া। তারপর যে যেমন পারে সেভাবে ওই ছাঁচের ভেতর এঁটে থাকা। আমার চাওয়া না-চাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি?

ছাঁচটার প্রতি মায়া নেই তোমার? ছাঁচ ছাড়া বাঁচতে পারবে?

কী জানি! হয়তো আছে। তবু--

কী তবু?

একটাই ৺াবন আমার, তোমার, সবার।

পুনর্জন্ম নেই বলছ?

আছে?

জীবনের বাইরে নেই হয়তো, কিন্তু এক জীবনের ভেতর পুনর্জন্ম হতে পারে, পারে না?

তা পারে হয়তো।

আচ্ছা, স্বামী-দেবতাটির প্রতি ভক্তি নেই তোমার?

ভক্তি?

মায়া বলব? নাকি ভালোবাসা?

তুমি কি কিছু জান না?

আচ্ছা বেশ, মায়াই বলছি তা হলে, নেই?

আছে। বেশ ভালো মানুষ তোমাদের প্রশান্তবাবু। একটা স্থির শান্তির সংসার করতে কোনো অসুবিধা নেই।

অথচ সেই স্থির সংসারে স্থির একটি সম্পর্কে তুমি অশান্ত হয়ে উঠছ। পাগলা হাওয়া লেগেছে তোমার গায়ে!

একটাই জীবন। স্থির শান্তি ছাড়াও মানুষের আরও কিছু চাওয়ার থাকতে পারে।

বিশেষ করে যে ছাঁচের ভেতরে ঢোকা না ঢোকায় ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বদলে সমাজের নিয়ম অভ্যাস যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়!

যন্ত্রের মতো? বেশ বলেছ। কিন্তু যন্ত্র ছাড়াও বাঁচতে পারবে না। বড়োজোর এক যান্ত্রিকতা থেকে নতুন এক যান্ত্রিকতায় ঢুকবে তুমি! যন্ত্র ভেঙে চুরমার করে খালি পায়ে ঘাসের পথে হাঁটতে পারবে না তুমি!

কী করে জানলে? আমায় নিয়ে ঘাসের পথে হেঁটেছ নাকি? নাকি হাঁটবে ভেবেছ?

ছাঁচ ভেঙে ফেলতে চাইছ শুধু আত্মসুখের জন্যে? তাহলে ছাঁচও ভাঙবে, নিজেও ভাঙবে!

বন্ধু চাওয়া কি আত্মসুখ? সঙ্গী চাওয়া? সঙ্গীর সঙ্গে ঘাসের বিছানায় শুয়ে থাকতে চাওয়া—এসব আত্মসুখ?

নয়?

আসলে সবই আত্মসুখ! পরার্থে জীবন বিসর্জন দেওয়ার মধ্যেও কোথাও বুঝি মহৎ হতে পারার সুখ তিরতির করে বয়ে যায় বুকের ভেতর!

নিজের মতো বাঁচতে চাইছ, তা বেশ, লেখো, পড়ো, একটা কাজের মধ্যে -- সৃষ্টি ও আবিষ্কারের আনন্দের মধ্যে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখে—

জীবন্ত মানুষের সঙ্গ চাইছি, যাকে ভালোবাসা যায়, যার সঙ্গে সূক্ষ্ম অনুভূতির বিনিময় সম্ভব হয়ে ওঠে!

ঝুঁকি আছে ওতে। এর থেকে কি ঢের ভালো নয় স্থির শান্তির পরিপাটি জীবন?

তুমি একদিন কবে যেন তোমার দেখা একটা বিদেশি সিনেমার কথা বলেছিলে—বৃষ্টির মধ্যে দুটি নিঃসঙ্গ ক্লান্ত নারী পুরুষ, সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে কাদার ভেতর ঘাসের ভেতর বসে ভিজছে। সঙ্গম করে না তারা, শুধু একে অপরকে তাদের মনের কথা বলে, শোনে!

তারপর নীরবতা। সোফার ওপরে আধশোয়া নির্ঝর উঠে বসে। সোজা তাকায় সুরমার দিকে। তার মুখ-চোখ আলো করে আছে কেমন এক নিষ্পাপ হাসি।

হাসছ কেন নিরুবাবু?

বাউণ্ডুলের পাল্লায় পড়ে বেশ গোছালো নারীও কেমন অস্থির এলোমেলো হয়ে যায়, তাই না? ভাবছি, আর হাসছি!

আমি খুব গোছালো?

নয়?

কে জানে!

একটা বড়োসড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গোছালো নারী-পুরুষ কত রকমের সাত-পাঁচ হিসেব করে। লাভ-লোকসান, সমাজ-সংসার—কত কিছু!

তা কি খারাপ?

খারাপ বলেছি কি আমি?

তবে?

প্রেম বল, বন্ধুত্ব বল, এতসব হিসেবের ধার ধারে না! গোছালো মানুষদের বোধহয়—

কী?

তাদের বোধহয় আর প্রেম বন্ধুত্ব হয়ে ওঠে না!

বাউণ্ডুলেরা বুঝি সব মহান প্রেমিক!

অন্তত প্রেমিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে তাদের।

বাউণ্ডুলে হাওয়া লেগে আমি এলোমেলো অস্থির হয়ে উঠেছি বলছ?

তুমি জান না?

জানি।

তবে?

তোমার কাছ থেকে শুনতে চাইছি। বেশ স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে বল দেখি।

স্পষ্টতায় কী থাকে? কী থাকে ব্যাখ্যায়?

কী থাকে?

শুধু আলো চাও? ছায়া চাও না?

চাই।

অন্ধকার চাও না?

চাই।

এখন এ পৃথিবীতে ভালো আলো নেই/ভাষার বেগের বিহ্বলতার শেষ করে অন্ধকার/মাঝে মাঝে জীবনের পথে আসে—

জীবনানন্দ?

আজকে সততা সত্য সুধা নেই,—কিন্তু পৃথিবীর পথে রূঢ়/রক্তাক্ত অন্যায় আলো বেনামদারের মতো জেগে/নিজেকে প্রাণের সূর্য ব'লে যদি এখনো প্রচার করে তবে/সে আলোর প্রতিবাদে আজকের পৃথিবীতে অন্য আলো নেই/অন্ধকার রয়ে গেছে।

সুরমা দেখল ঘরের কম আলোর শরীরে নির্ঝর মিশে যাচ্ছে ক্রমশ। তার স্বর শোনা যাচ্ছে, অথচ দেখা যাচ্ছে না তাকে।

নিরুবাবু? নির্ঝর?

বল।

দেখতে পাচ্ছি না তোমায়!

অনুভব করতে পারছ তো?

কী জানি!

সব কিছু বড়ো স্পষ্ট রূঢ় আলোর মধ্যে ফেলে নেড়েঘেঁটে চিরে চিরে দেখতে চাও তুমি?

কী জানি!

জানার তৃপ্তির চেয়ে না-জানার অতৃপ্তি ঢের ভালো নয় কি?

তুমি জানতে চাও না? রক্ত-মাংস-হাড়ে-মজ্জায় বেশ সাপটে ধরে স্পষ্ট আলোয়—

অনুভব চাই, যে অনুভবের মধ্যে জানা-অজানা আলোছায়া রোদবৃষ্টির মতো লেপটে থাকে!

সুরমা দেখল বৃষ্টি, বৃষ্টির মতো বাতাস কিংবা বাতাসের মতো বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে ঘর-বিছানা-বালিশ!

ঘুমের ভেতর জেগে উঠল সুরমা। কী একটা সুর, নাকি পাখির ডাক! শালিক এসেছে, দোয়েল, আরও কত রঙবেরঙের পাখি! ঘুরে ঘুরে উড়ছে, জল খাচ্ছে।

কত রকমের পাখি—চিনতে চেষ্টা করে সুরমা। টিয়া, চন্দনা, তিতির, ফিঙে, চড়াই, মুনিয়া! আশ্চর্য লাগছিল তার। মনে হচ্ছিল এভাবেই জেগে থাকবে সে। ঘুমোতে যেতে হবে না কোনোদিন। ওপরে তাকাল, খোলা আকাশ, মেঘহীন আকাশ অথচ চারপাশ বৃষ্টিময়। আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে কেমন এক মেঘরঙা আলো ছেয়ে আছে। সে আলোর গা দিয়ে বৃষ্টি ঝরছে, বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে!

সুরমা তার ঘন কালো চুল খুলে দিল। এলোমেলো করে দিয়ে সামনে পিছনে ছড়িয়ে দিল। চুলের গা দিয়ে জলবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। গড়িয়ে পড়তে পড়তে তারা পাখি হয়ে যাচ্ছে। সেই সদ্য জন্ম নেওয়া পাখির বাচ্চারা মিলতে মিলতে একটা ব্যাঙ্গমা পাখি হয়ে গেল!

ব্যাঙ্গমা বলল, গল্প শুনবে?

শুনব।

এক যে ছিল রাজপুত্র—বলে ব্যাঙ্গমা চুপ। বৃষ্টি থেমে গেছে। আর কোনো পাখি নেই। মেঘরঙা আলো ঘন হয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে না ব্যাঙ্গমাকে।

সুরমা বলল, তারপর?

রাজপুত্রের কোনো কিছুতে মন বসে না। শিকারে যায় না, রাজকাজ শেখে না, পাশা খেলে না। শুধু—

কী?

নদীতীরে ঘুরে বেড়ায় আপনমনে।

তারপর?

একদিন নদীতীরে ঘুরতে ঘুরতে সে দেখল ধপধপে এক রাজহাঁস। তারপর কী হল জান?

কী হল? রাজপুত্র ধরতে গেল রাজহাঁসকে, নাকি?

না, রাজপুত্র ধরে না কাউকে। পশু পাখি পতঙ্গ কিংবা মানুষ কাউকেই ধরে বেঁধে আনে না। সে নদীতীরে বসে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকল হাঁসটির দিকে আর আপনমনে গান গাইতে লাগল।

তারপর?

হাঁস নিজে থেকেই এল রাজপুত্রের কাছে। তার পায়ের কাছে চুপ ক'রে বসে গান শুনতে লাগল। তারপর?

আমি কি জানি? তুমি বল।

গান শেষ হল। হাসল রাজপুত্র। হাঁসটি এক রূপবতী কন্যা হয়ে গেল। কন্যা জড়িয়ে ধরল রাজপুত্রকে।

তারপর?

রাজপুত্র বলল, চল। কন্যা বলল, কোথায়? রাজপুত্র বলল, যে দেশ সবচেয়ে অজানা অচেনা তেমন কোনো দেশে!

তারপর?

কন্যা বলল, ভয় করে আমার, তোমার ভয় নেই? তুমি কি জান আমি কে? রাজপুত্র বলল, ভয়! কীসের ভয়? কে তুমি? কন্যা বলল, আমি হাঁসপরী। আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং দানবরাজ আমায় এখানে নিয়ে এসেছে। রাজপুত্র বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ দানবরাজকে? কন্যা বলল, দানবরাজের ভয়, তাছাড়া অজানা অচেনা দেশের ভয়! শুনে রাজপুত্র চুপ। তারপর কী হল বলতো?

কী হল? তুমি বল।

রাজপুত্র অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল, তাহলে কী চাও তুমি? কন্যা বলল, কোথাও যেতে চাই না। তুমি রোজ এখানে আসবে। আমরা দুজনে কথা বলব, গান গাইব, জড়াজড়ি করে ঘাসের বিছানায় শুয়ে থাকব! রাজপুত্র বলল, তোমার দানবরাজকে দেখাবে আমায়? কন্যা বলল, তাকে দেখতে চাইলে আমায় পাবে না।

থামলে কেন? বল।

রাজপুত্র বলল, কেন? কন্যা বলল, দানবরাজ আমার ভেতরেই আছে। আমার ভেতরে থেকেই আমায় বন্দী করে রেখেছে দানবরাজ। শুনে রাজপুত্র উঠে দাঁড়াল। কন্যা বলল, চলে যাচ্ছ? রাজপুত্র বলল, দানবরাজ তোমায় বন্দী করেছে নাকি তুমি পুষেছ তাকে? দানবরাজকে ছেড়ে দিয়ে যদি কোনোদিন আসতে পার আমার কাছে আর যদি আমার সঙ্গে চলে যেতে পার অচেনা অদেখা অজানা কোনো দেশে—

ব্যাঙ্গমার কথা আর শোনা যায় না। মেঘরঙা আলো মুছে গেল। সুরমা দেখল, শূন্য

ঘর, কেউ নেই। বৃষ্টি নেই, নেই পাখিরা, মাথার ওপর জমাট ছাদ—একটা প্রকাণ্ড খাঁচার মতো লাগছে ঘরটা।

ঘুমের ভেতর আবার ঘুম ছেয়ে এল সুরমার দু'চোখ জুড়ে। অস্ফুট স্বরে বলল সে, নির্ঝর, নিরুবাবু, আমরা বৃষ্টিতে ভিজব। লিখব আমি, গান গাইব। আমরা ভিজতে ভিজতে নদীর ভেতর নেমে যাব!

## পনেরো

কী হল লোকটার? কী হতি পারে?

গায়ের চাদর আলতোভাবে নামিয়ে দেয় গৌরী। জ্বর নামছে, ঘাম হচ্ছে। কাল রাত থেকেই গা ম্যাজম্যাজ মাথাধরা ছিল। ভোরে আর উঠতে পারছিল না। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছিল।

খাটে ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমোচ্ছিল। নীচে মাদুরে গৌরী। মেয়ে ঘুম ভেঙে ওঠার পর সেই যা করার করল। গৌরী ভাবছিল, গরিব ঘরের মেয়েরা কাজেকম্মে সব কিছুতেই একটু তাড়াতাড়ি পেকে ওঠে, ঠিক এটা, তবে তার নিজের মেয়েটা যে অনেক বড়ো হয়ে গেছে, আজ তা ভালোভাবে বুঝল। কতই বা বয়েস! এই বোশেখে বারো পেরিয়ে তেরো।

ঘুম থেকে উঠে মাকে শুয়ে থাকতে দেখেই মেয়ে বুঝেছিল, শরীর নিশ্চয় খারাপ মায়ের। কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল। জ্বরের ঘোরে তখন নড়াচড়া কথা বলতেও ইচ্ছা করছিল না গৌরীর। কিন্তু মেয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, নীচে শুয়ো না মা, খাটে ওঠ্।

হ্যাঁ, মেয়েটা মা-বাপের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তুই-তুমি মিশিয়ে ফেলে। তুই করেই বলত প্রথম প্রথম, কিন্তু গৌরী বাবুদের ঘরের বাচ্চা-কাচ্চাদের মতো তুমি বলা শিখিয়েছে। তা, মেয়ের ঘ্যানঘ্যানের চোটেই কোনোক্রমে উঠে খাটে গিয়ে শুয়েছিল। কিছু বলার আগেই মেয়ে ছুটল দুই কাজে—সব বাড়ি বাড়ি খবর দিতে যে মা আজ কাজে আসতে পারবে না আর দোকান থেকে জ্বরের ট্যাবলেট নিয়ে আসতে।

ফিরে আসল একটা ট্যাবলেট নিয়ে আর বলল, দীপুকাকুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বস্তি কমিটির দীপু বিশ্বাস। বড়ো ভালো মানুষটা। ভোলা নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে প্রায়ই খোঁজখবর নেয়। রাস্তায় দেখা হতেই কোথায় যাচ্ছে শুনে খসখস করে একটা কাগজে কী একটা ওষুধের নাম লিখে দিয়ে বলেছিল, একটা কিনবি, গিয়েই দিবি। আটটা থেকে হাসপাতালে আউটডোর চালু হবে, নিয়ে আসবি মাকে।

পাশ ফেরে গৌরী। বাচ্চাদের হল্লা, মাইকের অল্প শব্দ ভেসে আসছে। বস্তি কমিটির অনুষ্ঠান আছে আজ। দিদি আর ভাই গেছে সেখানে। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। বারোটা পর্যন্ত টিকিট হয়। দু'টাকা লাগে। তবে জ্বর ছেড়ে যাওয়ায় এখন গৌরীর আর ইচ্ছে নেই হাসপাতালে যাওয়ার।

দু'টাকায় না হয় ডাক্তার দেখানো হবে, কিন্তু ওষুধের দাম? সে তো কিনতে হবে দোকান থেকে। অন্তত পঞ্চাশ-ষাট টাকার নীচে কিছু হয় না, জানে গৌরী। আজকের দিনটা কাটুক না হয়। সর্দিজ্বর হয়তো, শুধু শুধু এতগুলো টাকা—ভাবতে ভাবতেই গৌরীর মনে আসে আবার, কী হল লোকটাব? কী হতি পারে?

যা শুনেছিল আগে, নিরুবাবু যা বললেন, বাজুর মা যা বলল, কিছুতেই মানতে চায় না মন তা সে যতই সত্যি হোক! আর কী হতে পাবে? ধর, ভোলা অন্য কোনো মেয়েছেলের টানে তাদের ফেলে রেখে অন্য কোথাও ঘব করতে চলে গেছে! হতে পারে না এমন? তা হলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে গৌরী!

গৌরী!

ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে ওঠে। এ তো দত্তবউদির গলা। দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর মাথা বাড়ায় দত্তবউদি। তারপর দরজা পুবো খুলে এক পা ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে হাঁক পাড়ে, কী হয়েছে রে তোর?

জ্বর।

তোর জ্বর হওয়ার আর সময় পেল না?

এমন প্রশ্নের উত্তরে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করে না গৌরীর। চুপ করে থাকে।

আজ আমার বাড়িতে অনুষ্ঠান, লোকজন খাবে আর তুই—ট্যাবলেট নিয়ে এসেছি, খেয়ে দেখ, একঘণ্টা পরে যদি—

পারব না।

তুই তো পারব না বলে খালাস। কিন্তু—

অন্য কাউকে খুঁজে নাও বউদি। আমি আর কাজ করব না। সেরে উঠলে হিসেবমতো মাইনে যা হয় দিও, নিয়ে আসব—শরীরে কষ্ট হলেও একনাগাড়ে কথাগুলো বেশ রাগত স্বরেই বলে গৌরী।

এমন উত্তরে মিইয়ে যায় গৌরীর দত্তবউদি, বাব্বা! তোদের কিছুই বলা যাবে না। আমি কী তাই বললাম, আমার অসুবিধার কথা ভাববি না একটু—তোর মেয়ে কোথায়?

কেন?

ও যদি একটু হেল্প করে—

আপনার মেইয়ে তো আমার মেইয়ের থেকে বয়েসে বড়ো, তাকে বলুন না!

কী বললি!

দু'বার বলতি পারব না—শুকনো কাশি আসে গৌরীর, হাঁফায়।

বড্ড বাড় বেড়েছে তোদের! মুখে যা আসে তাই বলছিস!

আমার শরীর ভালো নেই, যান এখন।

ইতিমধ্যেই আশেপাশের ঝুপড়ি থেকে দু'-একজন করে এসে ঘিরে দাঁড়ায়। একজন গলা চড়িয়ে বলে. কী হইছে রে গৌরী?

দত্তগিন্নির চোখমুখ লাল হয়ে ঘাম বেরোয়। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে পেছন ফিরে লাইনে পা বাড়াতেই কে যেন বলে—ট্রেন আসছে। দত্তগিন্নি খেয়াল করেন. হ্যাঁ ট্রেন আসছে, তবে অনেকটা দূরে। পা চালিয়ে লাইন পেরিয়ে ওপারে চলে যান।

ঘর ফাঁকা হয়ে যায় গৌরীর। রাগে এত কথা বলায়, দুর্বল শরীরের ভেতর কেমন যেন করে! তবু গৌরী বিড়বিড় করে, জ্বর হওয়ার আর সময় পেল না—কী ঢঙের কথা! কেন রে? জ্বর কি তোর পীরিতের নাগর না কী রে যে সময় বুঝে আসবে! তুই মাগী তোর গা একটু গরম হল কী হল না তিনদিন বিছানায় চিতিয়ে থাকিস। রান্না বন্ধ, হোটেল থেকে খাবার আসে! তোদের মতোন মাখনের গতর নাকি আমাদের! বিছানায় না পড়লে কাজ কামাই দেই আমরা?

গলা শুকিয়ে আসে। ভেতরের রাগ যেন আর কমতে চায় না! খাট থেকে নেমে প্লাস্টিকের জাগ থেকে দু'-তিন ঢোক জল খায়। মাথার ভেতর পাক দিচ্ছে! ধপাস করে বিছানায় শরীরটা ফেলে দেয় আবার!

না, দত্তবাড়ির কাজ আর করব না। এই বউদিটা বড্ড কথা শোনায়। কোনো কাজ পছন্দ হয় না তার, একদিন কামাই করলেই মাইনে কাটে!

মা?

গৌরীর মেয়ে, রত্না, মুড়ি নিয়ে এসেছে। আরেক হাতে এক গ্লাস চা।

তুই আনলি? পয়সা নিয়ে গেছলি, নাকি বাকিতে?

দীপুকাকু দিল জোর করে।

ঠোঙা থেকে বাটিতে মুড়ি ঢালে। স্টিলের থালার ওপর বাটি আর চায়ের গ্লাস নিয়ে মায়ের মাথার পাশে দাঁড়ায়।

গৌরী উঠে বসে। বলে, তুই নে মুড়ি।

নিচ্ছি।

খাটের ওপর থালা রেখে ঠোঙা নিয়ে মুড়ি দেয় মুখে। কাপ নিয়ে এসে একটু চা ঢেলে নেয়।

চা-মুড়ি খেতে খেতে গৌরী বলে, দত্তবউদি এসেছিল।

কেন? আমি তো বলে এসেছি।

খোঁজ নিতে, সত্যি জ্বর কি না—ওর বাড়িতে আজ খাওয়া-দাওয়া।

কেন? মেয়ের জন্মদিন?

তা জানি না। বলে দিছি কাজ করব না।

জ্বর ছেড়েছে? কপালে হাত দেয় রত্না, হাসপাতালে যেতে হবে?

না, থাক।

কেন?

আজকের দিনটা যাক।

ওষুধের টাকার কথা ভাবছ?

না, তা না, একদিন একটু জ্বরেই—

এর আগেও তো দু'দিন হল।

ডাক্তারের কাছে না গিয়েই সেরে গেছিল।

এত জ্বর হয়নি সেবার, একটু গা গরম। আজ সকালে তোমার গায়ে হাত দিয়ে দেখি উনুন—ওষুধের দাম লাগবে না।

কী বলিস?

ওষুধের দাম লাগবে না।

কে দেবে?

দীপুকাকু সারদা মেডিকেলে বলে রেখেছে, ওনার নাম করে হাসপাতালের কাগজ দেখালে দিয়ে দেবে।

চুপ করে যায় গৌরী। দীপুবাবু লোক ভালো। বস্তির জন্যে অনেক কিছু করে। ভোলা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রায়ই খোঁজখবর নেয়। কিন্তু গৌরীর মন তবু কেমন যেন খচখচ করে! মেয়ের দিকে তাকায় ভালো করে। সবে বাচ্চা থেকে মেয়ে হয়ে উঠলেও শরীরটা ফোটেনি এখনও, তবে আর ক'দিন? এক-দু'বছরের মধ্যেই ভরে উঠবে। মেয়ের রঙ কালো নয়, মুখখানাও মন্দ নয়, বেশ সোহাগমাখা।

না, দীপুবাবু লোক ভালো, তবে কি না কার কী মতলব! এই বস্তিতে কত মেয়েই তো—কম দেখেনি সে। কালীঘাট, হাড়কাটা, সোনাগাছি, কোথায় নেই রেলবস্তির মেয়ে! কেউ কেউ তো একদম বেপাত্তা হয়ে যায়, কোনো খবর পাওয়া যায় না তাদের! দিনকাল ভালো নয় মোটে! কার মনে যে কী আছে! জোয়ান মদ্দ একটা মানুষ হাপিশ হয়ে গেল! ছেলে-মেয়ে দুটো নিয়ে অনেক আশা, কী করে যে কী হবে এখন! মেয়েটাকে ছোঁ মেরে কেউ তুলে নিয়ে গেলে বাঁচাতে পারবে সে?

চা শেষ করে শরীরে যেন একটু বল পায় গৌরী। থালা তুলে নেয় রত্না। বলে, হাসপাতালে কি একটু পরে—

থাক আজকে।

রত্না বলে না কিছু। নিজের খাওয়া কাপটার জাগের জল ঢেলে ধুয়ে জানলা দিয়ে জল ফেলে দেয়।

তুই পড়তে বসবি না?

চায়ের গ্লাস দিয়ে আসি, তারপর দীপুকাকু বলছিল—

গ্লাস দিয়ে ঘরে আয়, দীপুকাকুর কথা ছাড়।

না, বস্তি কমিটির মিটিন্ আছে!

কী মিটিন্? তোর কি তাতে?

বাইরে থেকে অনেকে আসবে। গান হবে, বই খাতা শ্লেট দেবে, বিস্কুট দেবে!

চুপ করে যায় গৌরী। দু'-তিন মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে যায় রত্না। গৌরীর মনে পড়ে, কয়েকদিন আগে দীপুবাবু বলে গিয়েছিল, বস্তি কমিটির ডাকে ফান্সান্ হবে। কলকাতা থেকে বড়ো বড়ো বাবুরা আসবে।

তা, গত ক'বছরে অনেক কিছু করেছে বস্তি কমিটি। শনি-রবিবারে ইস্কুল বসিয়েছে। ফিরি পাইমারি ইস্কুলে, হাইইস্কুলে যায় বটে সব। লেখাপড়া কী আর শেখে! আলাদা করে মাস্টার না দিলে হয় না। বস্তিতে ক'জনের হয় সে ক্ষমতা? তা, বস্তি কমিটির স্কুলে দিদিমণিরা দাদাবাবুরা যত্ন করে শেখায়। অঙ্ক-টঙ্ক কঠিন যা সব আছে, পাশ করার মতো করে শিখিয়ে দেয়। বছরে দু'বার খাতা, বই, পেন, পেন্সিল, শ্লেট—যতটা পারে যত জনকে পারে দেয়। তবে আজকাল বস্তির মধ্যে উল্টো কথাও কেউ কেউ বলে। বড়োলোক দেশ আছে, অনেক দূরে, সেসব দেশের বড়ো বড়ো লোকেরা নাকি অনেক টাকা দেয় বস্তির লোকের ভালোর জন্য। তার কিছু নাকি খরচ করে দীপুবাবু আর তার চ্যালারা। বাকি টাকা নাকি দীপুবাবুর পকেটে। তা নিক, খাটছে, বস্তির কথা ভাবছে। আগে তো কেউ কোনোদিন বস্তির দিকে ট্যারা চোখেও তাকায়নি। দীপুবাবু যদি কিছু টাকা নেয় তো নিক, কিছু তো করছে বটে লোকটা!

আগে এই বস্তিতে দু-দুটো চোলাই মদের ঠেক ছিল। রোজ গোলমাল। মাঝে মাঝেই পুলিশ আসত, যাকে খুশি তুলে নিয়ে যেত। এখন বস্তি কমিটির গরজে বন্ধ হয়েছে মদের ঠেক। পলিথিনের প্যাকেটে লুকিয়ে-চুরিয়ে বিক্রি হলেও আগের মতো ঠেকবাজি হয় না।

মা!

রত্না ফিরে এসেছে।

কী হল?

গ্লাস দিয়ে এলাম, মিটিনে যাব?

গৌরী হাসে। মেয়েটা ভারি বাধ্য। একবার বারণ করায় ফিরে এসেছে।

তোর ভাই কই? বসে আছে ওখানে?

হ্যাঁ, একেবারে সামনে, চেয়ারে।

যা, ভাইকে দেখবি।

অনেক লোক হয়েছে। গাড়ি করে ফর্সা ফর্সা লোক এসেছে।

তাই?

শপথ না কি যেন নিতে হবে!

কী?

শপথ। একটা কাগজ দেখে মাইকে একজন পড়বে আর মাঠসুদ্ধু সবাই আবার সেকথা বলবে।

সে আবার কী?

ক'দিন আগে টেরেন বন্ধ হয়েছিল, মনে আছে?

হ্যাঁ।

দশ নম্বর রেলগেটের ওখানে তার ঝুলে গেছিল।

ও।

লাইনের ধার থেকে কারা মাটি কেটে নিয়েছিল, তাই পোস্ট আলগা হয়ে গিয়ে তার ঝুলে যায়। টেরেন বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ এসেছিল।

মাটি কাটল কে? লাইনের ধারের লোকেরা?

দোষ পড়েছে লাইনের ধারের বস্তির ওপর। তাই শপথ!

তা, আমরা কী করলাম? শপথ না কী বলছিস, তাতে আমরা কেন?

না, কী নাকি রেলের কারা আসবে, তাদের সামনে বলতে হবে—

কী?

আমরা রেলের যাতে ভালো হয় দেখব। কোনো বদমায়েশি করব না। রেললাইন পরিষ্কার রাখব—আরও কীসব বলতে হবে।

যা গিয়ে, ফেরার সময় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবি।

রত্না যায় না, দাঁড়িয়ে থাকে।

কী?

দীপুকাকু বলছিল—

কাশি আসে গৌরীর। রত্না এগিয়ে এসে জলের জাগ এনে দেয়। কাশতে গিয়ে যেন দম আটকে আসে গৌরীর। জল খায় কয়েক ঢোক। হাত থেকে জাগ ফসকে পড়ে যায় মাটিতে। মুখ বন্ধ ছিল, তবু সামান্য জল গড়িয়ে পড়ে। ন্যাতা এনে মুছে দেয় রত্না। একটু ধাতস্থ হয়ে গৌরী ভুরু কুঁচকে বলে, কী বলছিল দীপুকাকু?

কলকাতায় নিয়ে যাবে।

কী? আঁতকে ওঠে গৌরী।

কল—মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায় রত্না।

এখুনি গিয়ে ভাইকে নিয়ে ঘরে চলে আয়, আর যেতে হবে না ফান্‌সানে।

রত্না ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মায়ের মতিগতি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

দাঁড়িয়ে রইলি যে? গৌরীর গলায় ঝাঁঝ।

মেয়ে নড়ে না। মাথা নীচু করে থাকে।

দীপু তোমার কোন্ সম্পর্কের কাকা, শুনি? কেন কলকাতায় নিয়ে যাবে?

গঙ্গার ধারে কী একটা পার্ক হয়েছে, মিলেনিম পার্ক—লঞ্চে চড়াবে।

দরকার নেই। গরিব ঘরের মেয়ের অত পার্কে না গেলিও চলবে। এত দরদ কীসের তার?

মাথা নীচু করে দাঁত দিয়ে নখ কাটে রত্না। চোখের কোণে জল চিকচিক করে।

চড়া গলা নেমে আসে গৌরীর। বলে, তোর বাপের কোনো খবর নেই। বাঁচল না মরল কেউ জানে না। এখন এসব আসে তোর? হ্যাঁ রে, বাপ কি তোকে সোহাগ দিত না?

চুপ করেই থাকে রত্না। গাল বেয়ে জলের ধারা।

শোন, বড়ো হচ্ছিস, গরিব ঘর আমরা, মেয়েদের কত ঝক্কি জানিস? বস্তিতে আরও কত জনা আছে, সবাইকে ছেড়ে তোকে নিয়ে কেন দীপুবাবু—তোর বাপ নেই বলে কি তুই ভাগাড়ের—শিয়াল শকুন—

আরও অনেকে যাবে—ফোঁপায় রত্না।

অ্যাঁ?

রেলবস্তির অনেক বাচ্চা যাবে। সকালে যাবে সন্ধের মধ্যে চলে আসবে, পয়সা লাগবে না।

এবার চুপ করে থাকে গৌরী। বুঝতে পারে সে যা ভেবেছিল ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। মেয়ের দিকে তাকিয়ে মায়া হয় তার। ভদ্দরলোকের বাড়ির ছেলেমেয়েদের কত শখ-আহ্লাদ থাকে—রত্নারা তো কিছুই পায় না সেসব, যেমন কপাল!

আচ্ছা, যাস। সবাই মিলে গেলে যাবি।

দূর থেকে মাইকে গান ভেসে আসে। স্কুলের মাঠে বস্তি কমিটির ফান্‌সান। রত্না নড়ে না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েই থাকে। হালকা নীল রঙের সালোয়ার-কামিজ, বেশ নতুনই আছে। বোসবউদি তার মেয়েরটা দিয়ে দিয়েছিল। ওদের আলমারিতে ধরে না, দিয়ে দেয়।

যা, চুল ঠিক করে বেঁধে যা।

এবার আর কথা শোনে না রত্না, দ্রুত বেরিয়ে যায়।

রাগ হয়েছে মেয়ের—হাসে গৌরী। তুই বুঝবি কী করে? ঘরের মানুষটা হাপিশ

হয়ে গেল? ভ্যানিস একেবারে! বস্তিতে উঠতি বয়েসের মেয়ে নিয়ে ঘর করা—সবসময় ভয়। নেপুর দলবল এখন গা-ঢাকা দিলেও, কবে ফেরে, কী করে, গরিব মানুষের জন্যে পুলিশ কীই বা আর করবে! নিরুবাবু, রবিকাকা—যত দিন যাবে সব ভুলে যাবে। যে যার নিজের ধান্দায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কী যে করি!

দীপুবাবু লোক ভালো, তবু ভয় করে। যা দিনকাল, মানুষ চেনা বড়ো মুশকিল। কার মনে যে কী আছে! ভদ্দরবাড়ির লেখাপড়া জানা ছেলে হলেই যে ভালো হয়, তা তো নয়! ওই যে বোসবউদির বর, কেমন করে যেন তাকায়। বোঝে গৌরী। গায়ের কাপড়টা ভালোভাবে টেনেটুনে বসতে হয় তখন। রাত হলে ভদ্দরঘরের লেখাপড়া জানা কত ছেলে মদ গিলে নানা ঘরে এসে হুজ্জুতি করে। কেউ কেউ অবশ্য নিজেরাই টাকার লোভে ঘরে ঢুকিয়ে নেয়!

সবসময় ভয় করে গৌরীর, বড়ো ভয়! দীপুবাবুর হাসিখুশি মুখখানা মনে পড়ে। ও মুখ দেখলে ভরসা জাগার কথা, তবু ভয়! অনেক কাজ করেছে বস্তি কমিটি। দীপুবাবুই তাদের পাণ্ডা। সবই ঠিক, তবু রত্নার কলকাতা যাওয়ার কথা শুনেই ভয়ে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল তার।

এই ক'দিন আগেই বিরাট গোলমাল ঠেকিয়ে দিল বস্তি কমিটি। স্টেশনের কাছে নতুন ঘর বসেছে কিছু। পুরনোদের ঘরের পেছনে বিরাট গর্ত খুঁড়ে, তা প্রায় এক মানুষ সমান গর্ত, তার ওপর বাঁশ ফেলে চট ঝুলিয়ে হাগাখানার ব্যবস্থা। বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি-বাদল না হলে, এতে গন্ধ ছাড়ে না, তেমন কিছু অসুবিধা নেই।

নতুন ঘরের লোকজন পুরনো লোকেদের ব্যবস্থায় না গিয়ে উল্টোদিকের রেললাইন পারে বাজারের দোকানগুলোর পেছনের ঝোপে, ডোবায় হাগতে লাগল। মেয়েদের জন্যে একটু চট টাঙিয়ে দিল, আর মদ্দদের সেসবেরও বালাই নেই। আর যাবে কোথায়? একটু বৃষ্টির পর হাওয়া ছাড়লেই বিকট গন্ধ! গৌরীদের থেকেও অসুবিধা বেশি বাজারের দোকানদারদের! ব্যাস! একদিন ব্যবসায়ী-সমিতির লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে চড়াও হল। প্রচুর লোক। বাজারে আসা লোকজনও ছিল। তা ওই বস্তি কমিটিই সামাল দিল শেষমেশ।

খবর পেয়ে ছুটে আসল দীপুবাবু। মিটিনে বসল। নতুন লোকেদের দু'-একজন বাদে ঘরের পেছনে হাগাখানা করার জায়গা নেই, তো তাদের জন্যে অনেক দূরে ডোবার ধারে গর্ত খুঁড়ে ব্যবস্থা করা হল সেদিনই। দীপুবাবু বা বস্তি কমিটির লোকজন না থাকলে সেদিন রক্তারক্তি হয়ে যেত।

এমন মানুষটাকে নিয়ে কুচিন্তা করতেও মন সায় দেয় না। তবে কী না ওই যে মানুষ চেনা বড়ো দায়! ভয় করে গৌরীর। বড় ভয় হয়।

তাছাড়া, কপাল! গৌরী ভাবে, ফাটা কপাল আমার। সেই কচি বয়েস থেকে কম ঝামেলা পোয়ালাম! আরও কত বাকি কে জানে!

কী হল লোকটার? খুন করে ভাসিয়ে দিল খালে? প্রথম প্রথম কথাটা ভাবলে কেমন যেন বুক ধড়ফড় করে উঠত। এখন সয়ে গেছে! ধর যদি অন্য কোনো মেয়েছেলের সঙ্গে ভেগে যায় ভোলা, তবু ভালো, যাক গিয়ে, তবু বেঁচে থাকুক মানুষটা।

কিন্তু মন আবার বলে, হতে পারে না তা। পুরুষমানুষ চেনে গৌরী। তার জীবনে ভোলা তিন নম্বর। লোকটা পীরিত করে তাকে, পীরিত! হ্যাঁ, পীরিত! একদিন মঞ্জু বলেছিল, ওসব পীরিত-টিরিত রাইখো, মাগী দেইখলেই পুরুষমানুষের নোলা সকসক কইরে ওঠে। গতরখানাই আসল!

গতর!

হ্যাঁ, গতর রে পোড়ারমুখী! কোন্ গতরের টাইনে কে যে কোথায় যায়!

গতর! তা পঁয়ত্রিশ পার করেও গতরখানা কি একেবারে ঝলসে গেছে আমার। এখনও কি জ্বালা ধরে না পুরুষমানুষের বুকে! এটা হক কথা যে মেয়ে-পুরুষের পীরিত যতই বল শেষ পর্যন্ত গতর ছাড়া দাঁড়ায় না!

তা ধর যদি সত্যিই লোকটা অন্য কোনো মেয়েমানুষকে নিয়ে ভেগেও যায়, গৌরী জানে, আজ না হোক কাল ঠিক ফিরে আসবে সে। গতরই বল পীরিতই বল এমনই টান! তিন-তিনটে মানুষের মধ্যে এই মানুষটাই সত্যি সত্যি সবচেয়ে ভালো! একটু পাগলা গোছের হলেও টান ছিল গৌরীর ওপর। খোকা হওয়ার পর থেকে সংসারেও টান বাড়ছিল। মদ-জুয়া কমিয়ে দিয়েছিল। গৌরীর হাতে আগের থেকে বেশি টাকাই তুলে দিত।

বুকের ভেতর চিনচিন ব্যথা। আর কি কোনোদিন ফিরে আসবে না সে? আর কি কোনোদিন দেখতে পাব না তারে? ঠাকুর, হে মা কালী, দয়া কর, আমার মরদটাকে ফিরিয়ে দাও! আমি কী পাপ করেছি ঠাকুর! এত শাস্তি তুমি দাও কেন আমায়?

কী পাপ করলাম ঠাকুর? কী পাপ? খাটি খাই, লোভ করি না, চুরি করি না, কারও মন্দ করিনি। সে মানুষটাও তো কারও মন্দ করেনি। গরিব ছিলাম, কিন্তু ভালোই ছিলাম। দিব্যি চারজনে মিলে কেটে যেত আমাদের। হে মা কালী, রক্ষা কর, ফিরায়ে দাও আমার মরদটাকে!

বিড়বিড় করতে করতে টের পায় গৌরী, জ্বর আসছে আবার। পুরো একখানা ট্যাবলেট খেয়ে নিলেই ভালো হত বোধহয়। আধখানা খেয়েছিল সে। এর আগেরবার আধখানা খেয়েই জ্বর নেমে গিয়েছিল। অবশ্য এত জ্বর ছিল না সেবার।

আজ মেয়েটাকেই ভাত ফুটিয়ে নিতে হবে। আলু আছে, লঙ্কা-পেঁয়াজ আছে, ফ্যানাভাত করে গরম গরম খেয়ে নেবে। আগে ডাক্তারবাবুরা জ্বর হলে ভাত খেতে মানা করত, এখন অবশ্য ভাত খেতে বলে।

গৌরী ওঠে, আধখানা ট্যাবলেট রাখা ছিল তাকের ওপর। বের করে খেয়ে নেয়।

মাথা ঘুরছে, দুব্বল লাগছে বড়ো। শীত শীত করছে। চাদর টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে। তীব্র হর্ন দিতে দিতে একটা আপ ট্রেন ছুটে যায়।

## ষোলো

বেশ ক'দিন বৃষ্টি হয়নি। সকাল সাড়ে-দশটাতেই পথঘাট চারপাশ তেতে উঠেছে। স্টিল বাঁটের বড়ো কালো ছাতাটা মেলে ধরে হাঁটতে একটু কষ্ট হচ্ছিল কমলেশের। রবিবার আজ। রাস্তাঘাটে লোকজন বেশি। চায়ের দোকানগুলোতেও জটলা। এক মাইল পথ হেঁটে আসতে তাঁকে বারবার থামতে হচ্ছে। পরিচিত অনেকের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে দু-চার কথা। শরীব বোধহয় আর আগেব মতো নেই, তা হবে, আটাত্তর প্লাস বয়েসে তাঁর মতো এতটা সুস্থই বা ক'জন থাকতে পারে! প্রেসার ঠিক আছে, সুগারও নিয়ন্ত্রণে, বাত-টাত নেই, কোলেস্টেরলের বাড়াবাড়ি হয়েছিল একসময়, এখন নিয়ন্ত্রণে। দেখা হলে কতজনাই তো বলে, আপনার এত বয়েস মনেই হয় না। বুড়িয়ে যাওয়া, বিছানায় পড়ে থাকা বন্ধুরা বলে, রহস্যটা কী রে?

রহস্য? চা ছাড়া নেশা নেই কোনো, তাও চা গত কয়েক বছরে দিনে দু-তিন কাপে নামিয়ে এনেছেন। সভা-সমিতিতেও ঘন ঘন চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন বহু বছর। ভোরে ওঠা এবং হাঁটা, এ অভ্যাস বরাবর। সারা সুজনডাঙা চষে ফেলতে দুটো পা-ই যথেষ্ট তাঁর কাছে। সাইকেল নেই, রিকশা চড়েন কদাচিৎ। সারা জীবনই স্বল্পাহারী, আমিষ থেকে নিবামিষই বেশি পছন্দ, তবে আজও আমিষ পুরোপুরি বর্জন করেননি। আমিষ বলতে অবশ্য ছোট মাছ। ডিম, মাংস এসব ছেড়ে দিয়েছেন অনেককাল আগে।

রোদ্দুরের বেশ তাপ, তবে ঘাম হচ্ছে না বেশি এই যা রক্ষে। কুলকুলিয়ে ঘামলে যেন বেশি কষ্ট মনে হয কমলেশের। সকালে এক ঘণ্টা নষ্ট হল, বিরক্ত লাগছিল। সাড়ে-ন'টায় সভা, দশটায় দুজন এল। দশ জনের মধ্যে গৃহকর্তাকে নিয়ে সোয়া দশটা পর্যন্ত মোট চার জন। আসল সভা বিকেলে। তার আগে কয়েকজন মিলে একটু খোলামেলা মত বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল, অথচ যারা প্রস্তাব দিয়েছিল তারাই কেউ এল না।

গোলমাল বেধেছে টিভি কেবল্ নেটওয়ার্ক নিয়ে। পাঁচ-ছ'বছর আগে প্রথম যখন সুজনডাঙায় কেবল্ নেটওয়ার্ক চালু হয়, তখন তা ছিল পাড়াভিত্তিক। ডিস অ্যান্টেনা লাগিয়ে এক এক পাড়ায় একজন বা একটা গোষ্ঠী বাড়ি বাড়ি লাইন দিত। পরে এরা সবাই এক হয়ে গড়ে তোলে সুজনডাঙা মাস্টার কেবল্ নেটওয়ার্ক এবং কলকাতার একটি প্রধান পরিবেশক সংস্থার হয়ে অপারেটরের ভূমিকা পালন করতে থাকে।

গ্রাহকপিছু মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়া নিত সুজনডাঙা মাস্টার কেবল্ নেটওয়ার্ক বা এস এম সি এন। এক বাড়িতে দুটো লাইন হলে দুশো পঁচিশ। সম্প্রতি এটা বাড়িয়ে একশো আশি করা হয়েছে। গ্রাহকরা মানতে চাইছেন না, এই নিয়েই গোলমাল।

গ্রাহকরা কেবল্ কনজিউমার ফোরাম গড়ে এর প্রতিকার চাইছেন, তারই প্রথম বড়ো সভা আজ বিকেলে। আবার গ্রাহক ও অপারেটরদের মধ্যেও শুরু হয়েছে নানা রাজনৈতিক দল-উপদলের চাপান-উতোর ও কোঁদল। আর তাই কমলেশের ডাক পড়েছে বড় বেশি করে। একটা সমঝোতা, মধ্যপন্থায় এনে সব কিছু ঠিকঠাক মিলিয়ে দেওয়ার অঙ্ক কষতে। বয়েসে, বিচক্ষণতায়, প্রায় সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতায় কমলেশের মতো কে আর আছে সুজনডাঙায়?

দিনকয়েক আগে এস এম সি এন-এর কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে স্থানীয় পৌরপ্রধানের উপস্থিতিতে সভা করেছিলেন তিনি। ওঁদের বক্তব্য, চাপ আসছে কলকাতার পরিবেশক সংস্থাটি থেকে। হিসেব কষে ওঁরা বুঝিয়ে দিলেন সুজনডাঙার যত গ্রাহক, তাঁদের প্রকৃত সংখ্যাটি যদি কলকাতার সংস্থাকে জানানো হয় তাহলে এক-একজন গ্রাহককে দুশো পাঁচ টাকা করে দিতে হবে। সেখানে এঁরা নানাভাবে 'ম্যানেজ' করেন, প্রকৃত গ্রাহক সংখ্যা না দেখিয়ে অন্তত একশো আশির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন। এছাড়া অন্য উপায় নেই।

গ্রাহকদের অবশ্য অন্য বক্তব্য। তাঁরা বলছেন, গ্রাহকদের কোনো ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয় না। প্রতি মাসের ভাড়া বাবদ রসিদ দেওয়া হয় না, খাতায় লিখে সই করানো হয়, ফলে প্রকৃত গ্রাহক সংখ্যার অর্ধেকও দেখানো হয় কি না সন্দেহ। প্রচুর লাভ করছে এস এম সি এন। তাছাড়া, পাশের মাঝেরগ্রামে ওই একই সংস্থার অধীন হয়েও ওখানকার কেবল্ অপারেটররা এখনও একশো পঞ্চাশ টাকা নিচ্ছে কী করে? অভিযোগ আছে আরও। যেমন—প্রথম লাইন দেওয়ার সময় গ্রাহকপিছু পাঁচশো টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট নেওয়া হয়েছে তার রসিদও দেওয়া হয়নি আর তার ওপর সুদেরও কোনো হিসাব রাখা হচ্ছে না। আরেকটি অভিযোগও উঠেছে কোনো কোনো মহল থেকে, রাত বারোটার পর প্রতি শনিবার এস এম সি এন-এর নিজস্ব চ্যানেলে নীলছবি দেখানো হয়।

এস এম সি এন-এর সঙ্গে সভায় একদম শেষে নীলছবি দেখানোর প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন কমলেশ। প্রথমে কয়েক মিনিট ওরা চুপ করে ছিল, তারপর ওদের একজন, নাম মিহির, প্রায় অনুযোগের সুরে বলল, গ্রাহকরা চায় বলেই আমরা দেখাই। মাঝখানে এক-দু'সপ্তাহ বন্ধ করে দেখেছি, অজস্র ফোন আসে। রাস্তায় দেখা হলে সব গালাগালি করে বলে লাইন কেটে দেবে! আমরা কী করব বলুন? এর বিরুদ্ধে আপনাদের মতো সামান্য কিছু লোক হয়তো আছেন, কিন্তু বেশিরভাগই পক্ষে।

তখন অবশ্য পৌরপ্রধান মাথা নেড়ে বললেন, না, এটা চলতে পারে না। এটা

বেআইনি। এটা কিছুতেই চলতে দেব না। প্রয়োজনে আমি নিজে এস ডি পি ও-র সঙ্গে কথা বলব।

মিহির তখন মিনমিন করে বলল, ঠিক আছে, আপনারা যখন বলছেন, এই শনিবার থেকে বন্ধ করে দেব।

তা, সব দিক বিবেচনা করে মাসিক ভাড়া একশো সত্তরে রাখা যায় কি না এসব নিয়েই আজ বিকেলে গ্রাহকদের সভা। গ্রাহক বলতে সবাই নয়, যাঁরা ফোরামের সদস্য হয়েছেন তাঁদের নিয়ে। গ্রাহকদের একটা বড়ো অংশ অবশ্য একশো পঞ্চাশের এক পয়সা বেশি দিতে রাজি নন। কমলেশ ভাবছিলেন, সিকিউরিটি ডিপোজিটের সুদের হিসাব, নিয়মিত রসিদ দেওয়া এগুলো অবশ্য যে করেই হোক চালু করতে হবে।

বাড়ির গলির মুখে আসতেই দেখা হয়ে গেল গোবিন্দর সঙ্গে। গোবিন্দ বললেন, তোমার কাছেই এসেছি দাদা, গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িমুখো হলেন কমলেশ।

গোবিন্দ কমলেশের থেকে আট-দশ বছরের ছোটো। বহুদিনের পরিচয়। একসময় তিনিও সুজনডাঙায় নানা সাংস্কৃতিক কাজকর্মে জড়িয়ে থাকতেন। বিশেষত গোবিন্দর ছাপাখানা থেকে এখানে প্রায় বিনা খরচে অনেক পত্র-পত্রিকা বেরুত একসময়।

বাড়ি ঢুকে শেফালিকে ডেকে গোবিন্দর জন্যে চায়ের কথা বলে মুখোমুখি বসলেন। বললেন, আমার থেকে ঢের বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে তোমায়? শরীর কেমন?

ওই—চলছে একরকম। মনে শান্তি না থাকলে আর শরীরের দোষ কী?

কমলেশের মনে পড়ল, গোবিন্দর মেয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে ছেলে নিয়ে ওঁর বাড়িতে থাকে। নিজের ছেলেও অনেকদিন হল আলাদা বাসায়।

মেয়ের খবর কী? মিটল?

কী আর মিটবে দাদা! জামাইটাই হতচ্ছাড়া!

কী খবর তার?

আরও অধঃপাতে গেছে। ইদানীং খুব নেশা-টেশা করছে শুনছি।

আসে তোমাদের বাড়ি?

আসে মাঝে মাঝে। ছেলেকে না দেখলে তার নাকি মন কেমন করে! ছেলেরও বলিহারি, বাপকে পেলে আর ছাড়তে চায় না! অথচ বাপ কিছুই করেনি তার জন্যে। যত আলগা পীরিত!

তা হলে কী করবে? এভাবে তো—

সে ব্যাপারেই এসেছি তোমার কাছে। কচি মেয়ে নয় আমার যে মিউচ্যুয়াল ডিভোর্স করিয়ে আবার বিয়ের ব্যবস্থা করব। আবার ওই জামাইয়ের সঙ্গেও ঘর করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। নাতিটাও বড়ো হচ্ছে। আমরা চোখ বুজলে—

চুপ করে যান গোবিন্দ। কমলেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে পাঞ্জাবি খুলে আলনার ওপর

মেলে দেন। গোবিন্দকে 'বোসো, বাথরুম থেকে আসি' বলে ভেতরে যান।

গোবিন্দ টেবিল থেকে খবরের কাগজ তুলে নিয়ে চোখ বোলান। মল্লিকা চায়ের কাপ হাতে ঢুকে টেবিলে রেখে বলে, ভালো আছেন?

গোবিন্দ হাসেন, ওই চলছে একরকম। আপনার শরীর?

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

নাতিকে দেখলাম সেদিন, হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুব কথা বলছিল, কোন্ ক্লাস যেন?

থ্রি। চায়ে চুমুক দেন গোবিন্দ। হেসে বলেন, এই চায়ের জন্যে রোজ এ বাড়িতে আসতে ইচ্ছে হয়—চমৎকার!

হ্যাঁ, দাদা ওই একটি জিনিসে একটু বিলাসী। তবে এখন দিনে দু-তিন কাপের বেশি খান না।

কমলেশ এসে টেবিলে রাখা জলের বোতল থেকে কয়েক ঢোক জল খেয়ে হাতল-ঘেরা প্লাস্টিকের চেয়ার সিলিং ফ্যানের একদম নীচে নিয়ে এসে গোবিন্দর আরও কাছাকাছি বসেন। বলেন, হ্যাঁ, বল গোবিন্দ।

বুলু একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছিল জান তো? বছর দুই পড়ালো। স্কুলটা শুনছি অ্যাপ্রুভাল পাবে, এখন বসিয়ে দিল।

কোন্ স্কুল?

দমদম নাগেরবাজারের ওদিকে। স্কুল অ্যাপ্রুভাল পেলে চাকরি পাকা হবে। বুলু ছাড়াও আরও দু'জনকে বসিয়ে দিয়েছে। ওরা প্রায় ফ্রি সার্ভিস দিল এতদিন—এখন অন্যদের ঢোকাতে চাইছে— তোমার তো অনেক চেনা-জানা—

ওখানে আমার কোথায় চেনা-জানা?

দেখো কমলেশদা, সুজনডাঙার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে পার্টির বড়ো বড়ো নেতাদের সঙ্গে তোমার ওঠা-বসা, তুমি চাইলে ওদের থ্রুতে, ওখানেও তো এদের পার্টির লোকজন আছে।

মৃদু হাসেন কমলেশ। বলেন, নানা সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যতটা পারি থাকি, তাই সমাজ ও রাজনীতির মাথাদের সঙ্গে মেলামেশা আছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি বিরাট ক্ষমতাবান। নিজের ভাইপোর জন্যেও কোনোদিন কিছু বলিনি ওদের কাছে। বাড়ির ট্যাক্স কমানোর জন্যও আলাদাভাবে দরবার করিনি!

দাদা, এড়িয়ে যেও না। একটু ভাবো আমার কথা।

দেখো, আমি এদের বললে যদি তোমার উপকার হয়, সে না হয় আমি বলব, কিন্তু—তাতেই হবে।

স্কুলটা চালায় কারা? মানে—

একটা এন জি ও-র স্কুল, বস্তির ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

আচ্ছা, তুমি ডিটেলস লিখে দিয়ে যাও। স্কুলের নাম, ঠিকানা, বুলু কতদিন ওখানে কাজ করেছে।

সব লিখে এনেছি—বলতে বলতে জামার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে কমলেশের হাতে দেন গোবিন্দ। বলেন, খুব কষ্টে আছি। আজকাল ধরা-করা না করলে চেনা-জানা না থাকলে কিছু হয় না।

কাগজটা টেবিলের ড্রয়ারে একটা খামের ভেতর ঢুকিয়ে রাখেন কমলেশ।

গোবিন্দ বলেন, সব আমার কপাল! ছেলের ব্যাপারটাই ধর—অবশ্য কপালই বা বলছি কেন? হয়তো শিক্ষা দিতে পারিনি ঠিকঠাক। ব্যবসার জন্য ধার-দেনা করেও কত টাকা দিলাম ছেলেকে। একটা ছেলে আমার। ভাবলাম নিজের পায়ে দাঁড়াক ভালোভাবে, তারপর আমি শেষ জীবনটা একটু আরামে হাত-পা ছড়িয়ে, তা সে—

ছেলে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে, না কি?

আসে, মাসে একবার। না আসাই ভালো। চলে গেলেই নাতনির জন্যে কান্নাকাটি করে ছেলের মা। ছেলেকে ব্যবসায় দাঁড় করাতে গিয়ে নিজের প্রেসটার দিকে নজর দিতে পারলাম না। এখন ডিটিপি-র যুগ, লেটার প্রেস চলে না।

তুমি কি এখনও লেটার প্রেসেই আছো? ডিটিপি বসাওনি?

না। কমিশনে ডিটিপি-র কাজ করে দিই। ডিটিপি বসিয়ে, কাজের ছেলে রেখে, শরীর বলো অর্থ বলো—আমার এখন আর সামর্থ্য নেই। তাছাড়া, নতুন নতুন ছেলেরা ডিটিপি মেসিন বসিয়েছে। ঘরে ঘরে এখন ডিটিপি। সঙ্গে ছোটো অফসেট আছে অনেকের। সুজনডাঙা-মাঝেরগ্রাম মিলিয়ে এত কাজ কোথায় বল? কাজ ধরতেও নানারকম তেল, কোথাও ঘুষ, কমিশন!

এখানকার সবকটা স্কুলের কোশ্চেন পেপার থেকে অনেক কিছুই তুমিই করতে একসময়!

সেসব দিন ভুলে যাও দাদা! তা'লে একটা ঘটনা বলি—সুজনডাঙা গার্লস স্কুলের কোশ্চেন পেপার সহ ছাপার কাজ আমি প্রায় তিরিশ বছর ধরে করতাম। টেন্ডার হয়েছে, কোটেশন জমা দিয়েছি, কাজ পেয়েছি। অনেক সময় তিন-চার জন মিলে ভাগ করে কাজ করেছি। পুরোপুরি বাদ পড়িনি। ভালো কাজ আর কম দর, বিশ্বস্ততা—এসবের জন্যই তো এতদিন কাজ পেয়েছি। কী বল?

সে তো বটেই!

গত বছর ডায়েরি আর বুকলিস্টের কোটেশন জমা দেওয়ার পর স্কুলে খবর নিয়ে জানলাম, আমার হয়নি। তার আগের বছরও শুধু বুকলিস্টের কাজ পেয়েছিলাম, আর কিছু নয়। তা, কাজ পাইনি দেখে স্কুল-সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলাম।

সেক্রেটারি কে যেন? অনিমেষ?

হ্যাঁ, আমাদের মাস্টারমশাই সুধাময়বাবুর জামাই।

হ্যাঁ, সে তো ভালো ছেলে শুনেছি।

হ্যাঁ, সে ছেলে ভালো। ভালো মানে নিরীহ প্রকৃতির। স্কুলের সব কিছু এখন হেডমিস্ট্রেস। অনিমেষ বলল, আপনি স্কুলে এসে হেডদিদিমণির সঙ্গে দেখা করুন, আমি থাকব। পরদিন ওর সামনেই হেডদিদিমণির সঙ্গে কথাটা তুলতেই যাচ্ছেতাই ব্যবহার করল আমার সঙ্গে—বলতে বলতে গলা কাঁপছিল গোবিন্দর।

তুমি জানতে চাইলে না কেন কত রেটে কে কাজ পেয়েছে? নিয়ম অনুযায়ী তুমি জানতে চাইতেই পার।

ঠিক এই কথাটাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম খুব ভদ্রভাবে বিনয়ের সঙ্গে। শুনেই আমাকে বেরিয়ে যেতে বলল হেডদিদিমণি। দারোয়ান ডাকল। কমলেশদা, সুজনডাঙায় এত বছর আছি কোনোদিন আজ পর্যন্ত কোথাও এমন অপমানিত হইনি—কত জনকে বললাম তারপর, কিন্তু ওই দিদিমণির বিরুদ্ধে নাকি কেউ কিছু করতে পারবে না!

কেন?

ওর নাকি রাজ্য না জেলার কোনো বড়ো নেতার সঙ্গে খুব খাতির। সেক্রেটারির, ম্যানেজিং কমিটির অন্য মেম্বারদের, স্কুলের টিচারদের অনেকেরই ওর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারছে না।

অনিমেষ প্রতিবাদ করেনি?

আমার সামনে ওখানে কিছু বলেনি। পরে কমিটি মিটিঙে কিছু বলেছে কি না জানি না। মনে বড়ো কষ্ট হয় দাদা! অনেক হেডমাস্টার হেডমিস্ট্রেস দেখেছি, বিমলবাবুর কথা মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ। খুব ভালো মনে আছে।

কী দাপট! কত পড়াশোনা! ইচ্ছে করলে কত বড়ো কলেজে কী ইউনিভার্সিটিতে চলে যেতে পারতেন। ছাত্র থেকে টিচার সব ওঁর ব্যক্তিত্বের সামনে তটস্থ! স্কুল ছিল ওঁর ধ্যানজ্ঞান। আজও মাস্টারমশাই বল, পুরনো ছাত্ররা বল, ওঁর কথা বলে—তাদের কাজ করেছি, কোনোদিন এতটুকু অভদ্র ব্যবহার পাইনি। ছাত্রদের প্রতি কী মমতা! আবার প্রয়োজনে সাংঘাতিক কড়া! সত্তর-একাত্তরে প্রায় একা দাঁড়িয়ে টোকাটুকি রুখে দিয়েছিলেন। পরীক্ষা ভণ্ডুল করতেও সাহস পায়নি কেউ! ধীরেনবাবু লোক চিনতেন। ঠিক লোককে খুঁজে এনে বসিয়েছিলেন! আর এখন, রাজ্যটার একেবারে—

কী?

সর্বত্র দলবাজি করে করে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

তোমার কষ্ট আমি বুঝেছি গোবিন্দ, কিন্তু এ কথাটা বোধহয় ঠিক হল না।

কেন?

সব হেডস্যার আর হেডদিদিরাই ওরকম নন। তাছাড়া শিক্ষার কথাই যদি বল, গত পঁচিশ বছরে এখানে নতুন স্কুল হয়েছে কতগুলো, বলো? প্রাইমারি, জুনিয়র হাইস্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি মিলিয়ে, বলো? আপগ্রেডেশন হয়েছে? হয়নি।

পড়াশোনা হয় তাতে, বল? নিরপেক্ষভাবে বলবে।

পক্ষপাত করব কেন? আমার কী স্বার্থ? সব স্কুল একরকম নয়। সব টিচারও একরকম নন। জেনারালাইজেশন কোরো না!

টিউশানি?

টিউশানির দোষ কি শুধু টিচারদের? আমরা পাঠাই কেন? সে কি শুধু পড়াশোনা হয় না বলে, নাকি সবাই চাই আমাদের ছেলে-মেয়ে আরও ভালো রেজাল্ট করুক, স্টার পাক, জয়েন্টে চান্স পাক, বলো? আর গার্লস স্কুলে তো কেউ টিউশানি করে না। তাছাড়া দুটো-তিনটে স্কুলের অল্প কিছু মাস্টারমশাই বাদে ক'জন টিউশানি করেন সুজনডাঙায়?

টিউশানি কোনো সমস্যা নয় বলছ?

তা নয়, কেউ কেউ স্কুলে না পড়িয়ে বাড়িতে টোল খুলে বসেছেন। সেটাকে সমর্থন করছি না। কিন্তু শিক্ষার সমস্যা বলতে শুধু এটুকুই নয়— আরও স্কুল দরকার। একটা সেকশনে যদি সত্তর জন ছাত্র থাকে, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটে একজন মাস্টারমশাই যত ভালোই হোন না কেন—কতটা ঠিকঠাক পড়াতে পারবেন? প্রতিটি ছাত্রকে যত্ন নেওয়া তাঁর পক্ষে কি সম্ভব? আরও স্কুল দরকার, ক্লাস পিছু ছাত্র সংখ্যা কমানো দরকার— সেক্ষেত্রে সমস্যা টাকা। এত অর্থ কোথায় সরকারের হাতে?

তুমি ব্যাপারটাকে পলিটিক্যালি নিচ্ছ! টিচারদের কোনো দায়িত্ব নেই, সরকারের কোনো ব্যর্থতা নেই?

তাহলে তো তুমি যা বলছ সেটাও একটা পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট! দেখো, সমাজ পচছে, মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে, অতিরিক্ত ভোগবাদে ভেসে যাবে সবাই আর টিচাররা শুধু আদর্শবাদী হয়ে থাকবে তা হয় না। আসলে দেখতে হবে পেশাগত দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করছেন কি না শিক্ষকমশাইরা। জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় মাইনে পাচ্ছেন, সুতরাং মাইনে নিয়ে তাঁরা স্কুলে পড়াচ্ছেন কি না। আমার মনে হয় অনেকেই তাঁদের সাধ্যানুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন, আবার অনেকে করেন না। এ তো সব পেশাতেই আছে।

ছাড়ো, মতে মিলবে না।

শিক্ষা নিয়ে সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ বা পুরোপুরি সফল—এ দুটো স্টেটমেন্টই আমি মনে করি অর্ধসত্য। সুজনডাঙায় নতুন স্কুল হয়েছে, আরও দরকার। প্রাইমারি এডুকেশন সম্ভবত শতকরা একশো ভাগ মানুষের কাছে পৌঁছেছে। মিউনিসিপ্যালিটির হোল্ডিং নাম্বার ধরে হিসাব করলে সাক্ষরতাও প্রায় সেন্ট পার্সেন্ট। শিক্ষার পরিবেশ যদি বল— কোনো স্কুলে হয়তো দলবাজি বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গাফিলতি আছে। তা বলে সব

স্কুলেই এক অবস্থা তা নয়। তুমি পুরনো দিনের বিমলবাবুর কথা বলছিলে না?

তা তো বলছি, কেন ভুল বলছি না কি?

ভুল নয়, কিন্তু পরিস্থিতি পরিবেশ পাল্টে গেছে, এটা কি ভেবেছ? তখন বিমলবাবু যদি কোনো ছাত্রকে বেত মেরে অজ্ঞানও করে দিতেন, অভিভাবক কিছুই বলতেন না। কিন্তু আজ তেমন কিছু তো দূরের কথা, এর থেকে অনেক কম কিছু ঘটলেও অভিভাবক থানায় যাবেন, শিক্ষককে হাজতে যেতে হবে। সুজনডাঙাতেই এ ঘটনা ঘটেছে।

তখন বিমলবাবুরা অন্যায়ভাবে কাউকে শাস্তি দিতেন না।

সে কথাটাও ঠিক হল না, কোনো সময়ে অন্যায়ভাবে না হলেও ভুল তাঁদেরও হত, কিন্তু সমাজে একধরনের আনুগত্যের রেওয়াজ ছিল। আমি পঞ্চাশ-ষাট দশকের কথা বলছি। শিক্ষক ডাক্তার সরকারি অফিসার পুলিশ নেতা মন্ত্রী পরিবারের ক্ষেত্রে বাড়ির কর্তা বা বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ—এঁরা সকলেই একধরনের ভয়-ভক্তি পেতেন সমাজে। তাঁরা অন্যায় করলেও সমাজের একটা বড়ো অংশ সোরগোল করত না—সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ বোঝ?

সব কিছুই খুব কম বুঝি!

এটা যদি তোমার অকপট স্বীকারোক্তি হয় তবে ভালো লক্ষণ—যা বলছিলাম, গত তিরিশ বছরে আমাদের সমাজে এই সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ক্ষয় হয়েছে। সে জায়গায় কোথাও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে, আবার কোথাও বা তৈরি হয়েছে দায়দায়িত্বহীন একধরনের নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা!

রাগ করলে?

রাগতে দেখেছ কোনোদিন? উঁচু গলায় কথা বলা আমার স্বভাব সে তো জান। যাকগে, বুলুর ব্যাপারটা—

আমি বলব, কিন্তু কতটা কী হবে না-হবে—

বাইরে কেউ ডাকে, উঠে বারান্দায় যান কমলেশ। এসেছেন সুবীর চক্রবর্তী, সুজনডাঙা মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন প্রধান। দল থেকে বহিষ্কৃত বহু বছর। এখন একটা স্থানীয় সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন, জনকণ্ঠ, সম্পাদক তিনিই। দ্বিমাসিক কাগজ, সব সংখ্যাতেই স্থানীয় খবরে বর্তমান মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা থাকে, পাশাপাশি গল্প-কবিতাও ছাপা হয়। বয়েসে কমলেশের থেকে দু-এক বছরের বড়ো। কাগজ দিয়েই চলে যেতে চাইছিলেন, কমলেশ 'কথা আছে' বলে ডেকে নিয়ে আসেন ঘরে।

বেশ সুন্দর চেহারা সুবীরের। বয়েসকালে রূপবান ছিলেন তা এখনও বোঝা যায়। ধপধপে সাদা চুল অনেকটাই রয়ে গেছে মাথায়। ধুতি পাঞ্জাবি, কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সুবীরকে বসালেন কমলেশ।

জনকণ্ঠের গত সংখ্যার একটা খবর নিয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

চিঠি লিখে দিন, ছেপে দেব।

সেকথা অন্য, আগে শুনুন।

কোন্ খবর, বলুন?

আন্দাজ করতে পারছেন না?

ফুল ও পরিবেশ মেলার খবর কি?

পাঠক হিসেবে এবং মেলার একজন সামান্য আয়োজক হিসেবে খবরটা নিয়ে দু'কথা বলতে পারি তো?

আয়োজক মিউনিসিপ্যালিটি। আপনি আবাব—

না, মিউনিসিপ্যালিটি আমাদেব মতো অনেককে নিয়ে একটা কমিটি করে কাজ করে, আমিও আছি।

ও তো লোকদেখানো!

ভুল ধাবণা।

আচ্ছা বেশ, পুরো খবরটাতেই আপত্তি?

না, অনেক কিছু ঠিক লিখেছেন। নেগেটিভ দিকগুলো বলেছেন, কিন্তু পজিটিভ দিকের কথা বলেননি একটুও।

কীরকম? শুনি?

আগে যে সমালোচনাগুলো যথার্থ বলে মনে হয়েছে বলি --যেমন, মেলার শেষ দিনে বম্বের শিল্পী এনে নাচাগানা। আমরাও বিরোধিতা করেছি। আশা করি এবার থেকে হবে না এরকম।

কেন? চেয়ারম্যান বলছেন সংস্কৃতি একটা পরিষেবা। নামমাত্র টিকিটের বিনিময়ে তারা সুজনডাঙাবাসীকে সেই পরিষেবা দিয়েছেন, যার চাহিদা আছে।

সেটা তাঁর বক্তব্য। তবু বলি, তিনি যে দল করেন, তাঁদের যে আদর্শ, সেই আদর্শের সঙ্গে এই পরিষেবা খাপ খায় না। তাঁরা জনগণকে অন্য ধরনের পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা কোনো ক্লাবের অনুষ্ঠান নয়। প্রগতিশীল দল পরিচালিত মিউনিসিপ্যালিটি কেন এমন সংস্কৃতি প্রচার করবে যার প্রসারের জন্য টিভির চল্লিশ চ্যানেল সহ আছে বড়ো বড়ো বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান!

একথা কি সামনাসামনি বলেছেন তাঁকে?

না বলার কারণ কী? আমার হারাবার কী আছে? ওই অনুষ্ঠানের দিন আমরা অনেকেই ছিলাম না মাঠে। নীতি, আদর্শ, চেতনা, সংস্কৃতি—এসব ক্ষেত্রে কি সবসময় চাহিদা-যোগানের সূত্র চলে? যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেন, তাঁরা কি চলতি স্রোতে ভেসে পাবলিক যা চায় তাই দেবেন না কি পাল্টা স্রোত তৈরি করবেন?

আপনি খুব ভালো বলেন, রাজনীতি করলে খুব ভালো বক্তা হতেন।

আপনারা থাকতে আমি কেন?

এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন গোবিন্দ। এবারে একটু নড়ে উঠে মুখ খোলেন। ঠোঁট উল্টে বলেন, ফুল মেলা! পরিবেশ মেলা! ওদিকে পুকুর ভরাট হচ্ছে, গাছ কাটা হচ্ছে, তখন কি সবার চোখ বন্ধ থাকে?

এসব হচ্ছে বলেই বেশি করে দরকার পরিবেশ মেলার। একা মিউনিসিপ্যালিটি বন্ধ করতে পারবে না। আন্দোলন দরকার, সচেতনতা দরকার। তাছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির বাধায় গাছ কাটা বন্ধ হয়েছে বাবুরবাগানে। এই তো পাঁচ-ছ'মাস আগের কথা, সুজনডাঙায় পলিপ্যাক ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে—এগুলো কি চোখে পড়ে না আপনাদের?

বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠেন কমলেশ। শেফালি চা নিয়ে সুবীরের হাতে দিতে যায়, সুবীর বলেন, আমি চা ছেড়ে দিয়েছি।

তা'লে? গোবিন্দ খাও?

এই তো খেলাম!

যাক, দিয়ে যা আমায়। কমলেশ হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেন। চায়ে চুমুক মেরে শুরু করেন কমলেশ, আপনি লিখেছেন মেলা জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয়!

তাছাড়া আর কী? হাত ঘুরিয়ে বলেন সুবীর।

কমলেশ তীক্ষ্ণ চোখে সুবীরকে দেখেন, তারপর চায়ে আরেক চুমুক মেরে বলেন, খবরের কাগজ চালাতে গেলে খবরটা ঠিকঠাক সংগ্রহ করবেন তো, নাকি?

কেন?

মেলার জন্যে যে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়, তার আশি শতাংশ আসে স্যুভেনির, ব্যক্তিগত দান ও চাঁদা থেকে!

মিউনিসিপ্যালিটি চাঁদা তুলবে? এ কীরকম? কনট্রাক্টর থেকে ছোটো ব্যবসায়ীর স্যুভেনিরে বিজ্ঞাপন না দিয়ে উপায় আছে!

এ অন্য কথা, যদি চাঁদা নিয়ে জুলুম হয়, সেটা অন্যায়। কিন্তু ট্যাক্সের পয়সা নয় অথচ না জেনে আপনি দুম করে তাই লিখে দিলেন!

বেশ, ভুল হয়েছে মানছি। আর?

ফুল ও পরিবেশ মেলা শুধুই অর্থের অপচয়? এর ভালো দিক নেই? গত চার বছর ধরে মেলা চলার পর সুজনডাঙার ফুল-ব্যবসা কত বেড়েছে জানেন? কত বেকার ছেলে ফুল চাষ, ফুল নার্শারি, ফুল সাপ্লাই করে রোজগার করতে শুরু করেছে, খবর রাখেন?

এ আপনি বাড়িয়ে বলছেন।

একটুও না। আপনি চলুন আমার সঙ্গে, আমি সেইসব ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব আপনার। শুধুই ফুল নিয়ে খেলা হচ্ছে না!

চুপ করে থাকেন সুবীর। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুখ থমথমে হয়ে গেলেও আবার যেন জোর করে হাসি ফুটিয়ে তোলেন। বলেন, ঠিক আছে, সংক্ষেপে এই বক্তব্য জানিয়ে চিঠি লিখুন, ছেপে দেব।

ফেব্রুয়ারিতে মেলা, এপ্রিল সংখ্যায় খবর, পরের সংখ্যা বেরুল জুলাইতে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আর চিঠি ছেপে কী হবে বলুন!

আগেই জানাতে পারতেন, তাহলে এ সংখ্যাতেই বেরিয়ে যেত।

আপনার সঙ্গে আর দেখা হল কই!

ফোন করতে পারতেন।

আপনি কোথায় যেন গিয়েছিলেন, সিমলাতে, ছেলের কাছে?

সে তো অনেকদিন হল ফিরেছি।

যাক, চিঠি ছাপা না-ছাপা বড়ো কথা নয়, আপনাকে কথাগুলো জানানো দরকার ছিল বলে ভেবেছিলাম, তাই জানালাম। আসলে কী জানেন?

কী?

বিরোধী কণ্ঠ থাকুক, সমালোচনা হোক, প্রয়োজন আছে তার। কাজ যে করে তার ভুল হয়, ক্ষমতার মোহে অন্যায়ও করে, কিন্তু অন্তত আপনার কাছ থেকে আরেকটু চিন্তা—মানে আরেকটু গভীর সমালোচনা আশা করি।

ভালো। মনে রাখব। উঠি তা'লে?

উঠে দাঁড়ান সুবীর। গোবিন্দও উঠে দাঁড়ান। কমলেশকে নিচু স্বরে বলেন, ওটা কিন্তু মনে রেখো।

কমলেশ মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করেন। ওঁদের দুজনকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেন। ঘরে এসে ফ্যানের তলায় বসতেই শরীর দুর্বল লাগে। মল্লিকা ঢোকে। বলে, কী? শরীর খারাপ লাগছে? সকাল ন'টা থেকে টইটই, তারপর ফিরে এসে বকবক, চেঁচানি এতক্ষণ ধরে, শরীরের আর দোষ কী?

কমলেশ বালিশ মাথায় দিয়ে টানটান শুয়ে পড়েন বিছানায়। গত কয়েকদিন রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। মাঝরাতে, দুটো-আড়াইটে নাগাদ ঘুম ভেঙে উঠে বাথরুম থেকে এসে বিছানায় শুয়ে থাকা। ঘুম আর আসে না। দুপুরে ঘুমোন না তিনি। তবে গত কয়েকদিন ক্লান্তিতে ঘুম এসে যাচ্ছে। তবে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখেন, যাতে সে ঘুম তিরিশ মিনিটের বেশি না হয়।

সুবীরবাবুর একসময় কী দাপট ছিল সুজনডাঙায়! তুখোড় বক্তা, গান গাইতেন ভালো, রবীন্দ্রসঙ্গীত, গণসঙ্গীত। একাত্তর সালে প্রথম নির্বাচিত বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরে সাতাত্তর থেকে সাতাশি আরও দশ বছর। তারপর দল তাঁকে প্রার্থী করল না। তিনি নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। হেরে ভূত হলেন, জামানত গেল। শেষ হয়ে গেল

রাজনৈতিক জীবন। দলের ভেতরে থেকে যদি লড়াই চালাতেন, তাহলে হয়তো আবার নেতৃত্বে ফিরতেন! ক্ষমতার লোভ আর নিজেকে দলের থেকে বড়ো ভাবা, এই দুটো মিলেই শেষ হয়ে গেলেন। অথচ মানুষটার মধ্যে অনেক গুণ ছিল।

এইসব ভাবতে ভাবতে কমলেশের মনে পড়ল ধীরেনবাবুর একনায়কতন্ত্রী কাজকর্মের বিরুদ্ধে নাগরিক সমিতির আন্দোলনে সুবীরবাবু কত সাহায্য করতেন, আইনি পরামর্শ দিয়ে, আন্দোলনের কর্মসূচি তৈরি করে দিয়ে—জীবনে ত্যাগও আছে অনেক। বড়ো চাকরি করতেন বিদেশি কোম্পানিতে। দলের কাজে বেশি সময় দেওয়ার জন্য চাকরি ছেড়ে আইন ব্যবসার অনিশ্চিত পেশা বেছে নিলেন। বেশ কয়েকবার জেলে গেছেন, মার খেয়েছেন। একবার গুণ্ডারা এমন মার মেরেছিল যে মরেও যেতে পারতেন। কিন্তু দলের মধ্যেই ক্রমশ তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়তে লাগল। অভিযোগ উঠল মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনায় দলের সিদ্ধান্ত মানছেন না, ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবল। দলীয় সম্মেলনে হেরে গেলেন।

কমলেশ ভাবেন, ক্ষমতা কি মানুষকে অন্ধ করে দেয়? বিবেচনাশক্তি হারিয়ে যায়? সুবীরবাবু তো আদর্শ নিয়ে দল করতে এসেছিলেন। তখন তো জানতেন না তিনি পরে সুজনডাঙার চেয়ারম্যান হবেন। কত ঝুঁকি নিয়েছেন জীবনে। সংসারের দিকেও মন দিতে পারেননি সেভাবে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বড়ো ছেলে ছাড়া আর কেউই সেভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কী হত দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে? একজন সাধারণ কর্মী হয়েই না হয় কাজ করতেন। ভুল শুধরে নিলে আবার হয়তো একদিন তিনি দলে যোগ্য মর্যাদা পেতেন।

গত পঞ্চাশ বছরে কত কী ঘটে গেল সুজনডাঙায়—পঞ্চাশ বছর! অথচ সব যেন স্পষ্ট মনে পড়ে কমলেশের। এত স্পষ্ট যে, মনে হয় কালকে ঘটেছে সব।

সেই ধানখেত, বিল, হোগলা বনের জায়গা আজ রীতিমতো শহর! আজকের প্রজন্ম, বিশেষত যাদের জন্ম সত্তর দশকে, তাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয় কী ছিল এই সুজনডাঙা! সহায়-সম্বলহীন হাজার হাজার মানুষ দেশ ছেড়ে নতুন এক দেশে বসতি গড়ে সুজনডাঙার মতো কত আশ্চর্য সব নগর তৈরি করেছে—শিক্ষায় ধনে মানে উন্নত হয়েছে। দেশভাগের সবটাই বোধহয় খারাপ হয়নি বাঙালির পক্ষে! এপার-ওপার দু'বাংলাতেই দেশভাগের ধাক্কায় বহু মানুষ যেমন এগিয়ে গেছে, তেমন আবার বহু মানুষ এত উঁচুতে উঠে আসতে পেরেছে, যা তারা হয়তো ওই ধাক্কা না লাগলে পারত না! নাকি ভুল হয়ে যাচ্ছে কোথাও? অল্প কিছু মানুষের ভালো হলেও দেশভাগের ধাক্কায় দুই বাংলারই অর্থনীতি চরম বিপর্যস্ত হয়েছে! ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগি সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির টিকে থাকার এক স্থায়ী সুযোগ করে দিয়েছে। এ -বাংলাতে হয়তো বাড়তে পারেনি তারা, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা রয়েই গেছে সবসময়। ঠিক কি? ভারতের যেসব রাজ্যে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ভাগাভাগি হয়নি, সেখানেই বরং সাম্প্রদায়িক শক্তি

শক্ত ঘাঁটি গেঁড়েছে। আবার ও-বাংলাতে ওই ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিকে হারিয়ে দিয়েই মাথা তুলেছে স্বাধীন বাংলাদেশ! হয়তো কখনও তার আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে মৌলবাদী মেঘে, কিন্তু নীল আকাশও আছে!

আচ্ছা, আজ থেকে একশো বছর পরে কেমন হবে আমাদের সুজনডাঙা? কোনো মন্ত্রবলে, কোনো যাদুবলে একশো বছর পর যদি আমাকে নামিয়ে দেওয়া হয় এখানে কেমন লাগবে আমার?

ভেবে নিজের মনেই ফিকফিক করে হাসতে লাগলেন কমলেশ। ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে যে কোনো দিন—দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি নিশিদিন, তাই কি এমন ভাবনা?

ধীরেনবাবুদের আমলে কো-অপারেটিভ যে সুজনডাঙা গড়ে তুলতে শুরু করেছিল, আজ বোধহয় তা আরও দ্রুত ছুটে চলেছে। গত বিশ-পঁচিশ বছরে কত কিছু হল—এখানে কাঁচা রাস্তা আজ আর প্রায় চোখেই পড়ে না, পাকা ড্রেন বেশিরভাগ ওয়ার্ডে, বাড়ি বাড়ি ট্যাপ কলের জল, টাউন হল, এতগুলো পার্ক, হাসপাতাল—প্রতি হাজারে সুজনডাঙার শিশু-মৃত্যুহার এবছরে কমে দাঁড়িয়েছে আট, প্রসবকালীন মাতৃ-মৃত্যুহার শূন্য, ভাবা যায়? আবার যত নগর হয়ে উঠছে, নতুন নতুন সমস্যাও বাড়ছে। সমাধানও হবে। আবার আসবে নতুন সমস্যা। এভাবেই এগিয়ে চলা—নাকি? এগিয়ে চলাই তো সার।

চোখের পাতা বুজে আসে, শুধু ঠোঁট দুটো নড়ে। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে থাকেন কমলেশ।

## সতেরো

তুমি বড়ো সিনিক হয়ে যাচ্ছ আজকাল!

হাতের তালুর ওপর মুখ-মাথার ভর, কনুই দুটো পায়ের ওপর, মাথা নিচু করে বসে ছিল নির্ঝর। আমি তো সিনিক, চিরকালই, না কি? এ আর নতুন কথা কী হল? এরকম কিছু বলার ইচ্ছে হলেও বলে না, হাত ছড়িয়ে সোফায় মেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসে। বহু দিনের বৃষ্টিহীন চোখে-মুখে যেন ম্লান হাসির রঙ লেগে আছে।

দূরে কোথায় যেন ঢাক বাজছে। পুজো আসতে এখনও দিন পনেরো বাকি। তবে বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকেই বাতাসে কেমন এক পুজো-পুজো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আগের মতো তীব্রভাবে না হলেও এখনও সে-গন্ধের একটু-আধটু রেশ টের পায় নির্ঝর।

গত দু'মাসে তার জীবনে নাড়া দেওয়ার মতো দুটি ঘটনা ঘটে গেছে। অবশ্য দুটি ঘটনাকে হয়তো ঠিক এক ব্র্যাকেটে রাখা যায় না। নির্ঝরের জীবনে দুটি ঘটনার

প্রতিক্রিয়ার তুলনাও চলে না। একটিকে কি সে ঘটনা ভাবতে পারে না কি দুর্ঘটনা? অবশ্য আটাত্তর প্লাস বয়েসে একটি মানুষের মৃত্যুকে কি দুর্ঘটনা ভাবা যায়? তবে কমলেশের যেরকম স্বাস্থ্য, শরীরে মৃত্যুর কোনো আভাসও ছিল না। লিপিড প্রোফাইল রিপোর্ট অনুযায়ী কোলেস্টোরল নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাত-আট মাস আগে শেষ যে ইসিজি রিপোর্ট এসেছিল, তাতেও তো সতর্ক হওয়ার মতো কিছু ছিল না! তবুও রাতে ঘুমের মাঝে মানুষটি কাউকে কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়ে, শেষ কথাটুকু বলার সুযোগ না পেয়ে যেভাবে অতর্কিতে চলে গেলেন—তাকে কেউ দুর্ঘটনা ভাবলে অযৌক্তিক ভাবা যায় না হয়তো।

কী হল? বড়ো চুপচাপ, কথা বলো।

এক সিনিক মানুষের কথা শুনতে ভালো লাগবে কি? খুব ক্লান্ত স্বরে শব্দগুলো ছুঁড়ে দিতে পারে নির্ঝর।

সুরমা বলে, সিনিক বলায় আপত্তি হল খুব?

আপত্তি কেন হবে? তবে কি না—এ খুব পুরনো কথা, খুব স্বাভাবিক মূল্যায়ন।

তাই? কী জানি, আমি যে মানুষটার সঙ্গ পেয়ে, কথা বলে, জীবনের মধ্যে একটা অন্য আশ্বাস, বেঁচে থাকার একটা অন্য মানে খুঁজে পেয়েছি, তাকে চিরদিনের সিনিক ভাবি কী করে?

ছাড়ো ওসব, বরং তুমি বলো, আমি চুপ করে শুনি।

কী বলব?

নেই কিছু বলার? বেশ, তবে কী লিখেছ পড়ে শোনাও।

তুমি যেন আরও রোগা হয়েছ, চোখ-মুখ বসে গেছে। মনের কষ্ট যেন শরীরে—

বলতে বলতে চুপ করে যায় সুরমা! নির্ঝরের চোখে-মুখে কেমন এক যন্ত্রণার ছায়া ফুটে উঠেছে। ভারি মমতা হয় তার। মনে হয় কোলের কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

ভোলার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নির্ঝরকে ধাক্কা দিয়েছিল খুব। তারপর কমলেশের মৃত্যু। মৃত্যুর পরদিন যখন দেখা হয়েছিল নির্ঝরের সঙ্গে ওদের বাড়িতে, বাচ্চা ছেলের মতো সেদিন অঝোরে কেঁদেছিল নির্ঝর।

এর মধ্যে অবশ্য একটু আনন্দের খবর এসেছে তার কাছে। নেপু ও তার শাগরেদরা ধরা পড়েছে। পুলিশ কোর্টে তুলেছে। কোর্ট জামিন দেয়নি। পুলিশ কাস্টডিতেই আছে। তবে নির্ঝর এতে খানিকটা স্বস্তি শান্তি পেলেও খুব আশাবাদী নয় যে ওরা শেষ পর্যন্ত শাস্তি পাবে। তার ধারণা শেষ পর্যন্ত ভালো উকিল দিয়ে, এদিক-ওদিক টাকা ছড়িয়ে, ঘুষ দিয়ে ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে। নির্ঝর একটু আগেই বলেছিল, মানুষ পচে গেছে, মানুষের তৈরি ব্যবস্থাটাও পচে গেছে। গরিব মানুষ কি কোনো ন্যায়বিচার পাবে?

সুরমা চেয়ার ছেড়ে উঠে নির্ঝরের পাশে বসে বলে, কষ্ট হচ্ছে? জেঠুর কথা মনে পড়ছে?

মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে জান! একদম একা হয়ে গেছে।

একটা কথা বলব?

বিয়ের কথা ছাড়া অন্য যে কোনো কথা বলতে পার।

নিজের কথা না হয় ছেড়ে দিলে, মায়ের কথা ভাববে না?

আয় নেই, চালচুলোর ঠিক নেই, বাউণ্ডুলে বেহিসেবি এই অপদার্থকে কে করবে বিয়ে?

তুমি রাজি কি না তাই বল। কে করবে না-করবে সে দেখা যাবে। একটা বছর ঘুরে গেলেই—

নির্ঝরের চোখে মৃদু হাসির ঝিলিক, এমনভাবে বলছ যেন তুমিই পাত্রী!

সে আর কী করে হবে বল? বিশ বছর আগে দেখা হলে না হয়—

আবার নীরবতা। বাইরে অন্ধকার। ঘর জুড়ে টেবিলল্যাম্পের আলো-আঁধারি। গা ঘেঁষে বসে আছে সুরমা। নির্ঝরের একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের দু'হাতের ভেতর নিবিড় মমতায় ঢেকে দেয়। কেমন যেন শীতবোধ করে নির্ঝর! যেন এক আশ্চর্য শীতের সন্ধ্যা! যে সন্ধ্যায় বহুদিনের বৃষ্টিহীনতার পর ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে! গন্ধরাজ দোপাটির কচিপাতা শিউরে উঠছে!

নিরু?

বলো।

সুজনডাঙা নিয়ে একটা লেখা শুরু করেছিলে না?

হ্যাঁ।

কী হল তার?

হারিয়ে গেছে।

কী?

ওই—হারিয়ে গেছে মানে থেমে গেছে।

আবার শুরু করা যায় না?

জানি না।

কতটা লিখেছিলে?

তা, বিশ-পঁচিশ পাতা।

মায়া হয় না তোমার?

মায়া? কীসের? কার ওপর?

ওই লেখাটার ওপর—পাতার ওপর এখনও জেগে থাকা শব্দ ভাবনার ওপর?

পাগল!

সে তো তুমি, আমি পাগলী! পাগল না হলে লেখা যায়? ভালোবাসা যায়? স্রষ্টা হওয়া যায়?

আমি কি তাই? আমি এক অপদার্থ বাউণ্ডুলে—অক্ষম অলস ভাবুক, শুধু ভাবি আর প্রশ্ন করি।

কী এত প্রশ্ন তোমার?

সে অনেক কিছু।

শুনি।

সেসব কি বলা যায় এককথায়? কেন বেঁচে থাকা থেকে শুরু করে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তো প্রশ্ন আর প্রশ্ন।

বেশ। তাহলে সেই প্রশ্নের কথাই লেখো না হয়!

তুমি তো জান আমি শুরু করি কিন্তু শেষ করি না।

ঠিক আছে, শেষের কথা না হয় পরে ভাবা যাবে। আবার নতুন করে শুরু কর।

কী লিখব?

কেন? যা লিখতে শুরু করেছিলে। এই সুজনডাঙা, তার জন্ম, এখানকার মানুষ, নানা স্মৃতি—

সুজনডাঙা পচে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, বাবু ভদ্রলোকদের সুজনডাঙা। ক্রমাগত কলকাতা হয়ে ওঠা সুজনডাঙাকে আমার আর ভালো লাগে না।

সেই ভালো না লাগার কথাই লেখো না হয়!

কী হবে লিখে?

এ যেন আমার কথা তুমি বলছ—একদিন একথা তোমায় আমি বলেছিলাম। তুমি সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলে তা বলব না আমি, আমি বরং প্রশ্নের বদলে আরেকটা প্রশ্ন করব, না লিখে কী হবে বলো?

চুপ করে থাকে নির্ঝর। ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে আবার। পুরো শরীরটাকে সোফায় তুলে দিয়ে মাথা হেলিয়ে দেয় সুরমার কোলে।

চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে সুরমা বলে, পুরো বাবু ভদ্রলোকদের সুজনডাঙাই কি পচে গেছে? ভোলার খুনীরা ধরা পড়ল তো? রবি মণ্ডলের মতো মানুষ কি নেই সুজনডাঙায়?

পচে গেছে নয়, চিরকাল পচেই ছিল—ভোলা গৌরীরা চিরকাল বঞ্চিত থেকে গেছে। পৃথিবীর সবটুকু শাঁস-জল চেটেপুটে খেয়ে গেছে ভদ্রলোকেরা—

ভোলার কথা লেখো তবে, গৌরীর কথা লেখো। আর একটা কথা—

কী?

অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিভাজনকে মানুষকে বিচার করার একমাত্র মাপকাঠি বলে মানছ তুমি? মানতে চাও না তো!

ধন্দ লাগে জান। এক-একসময় এক-একরকম মনে হয়, মনে হয় শ্রেণী নয় মানুষ, শ্রেণী নির্বিশেষে কিছু মানবিক গুণ বা দোষ থাকে—অর্থনৈতিক শ্রেণীবিচার নয় সেটাই আসল। আবার কখনও, জীবনকে ইতিহাসকে গভীরভাবে অনুভব করতে গিয়ে মনে হয়, ওই শ্রেণীবিচার একমাত্র না হলেও মানুষের চিন্তা-ভাবনা কর্মকাণ্ড সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণের প্রধান মাপ—না, মাপকাঠি-টাঠি ঠিক নয়, কীসের মাপ? মানে একটা দিশা বলতে পারো।

আমার কি মনে হয় বলব?

বলো।

সামান্য কথা অবশ্য, ভারি ইনটেলেকচুয়াল কথা নয় কিছু।

ঢের ইনটেলেকচুয়ালিজম হয়েছে পৃথিবীতে। তার চোটে পৃথিবীর শ্বাসবায়ু বন্ধ হওয়ার জোগাড়—একটু অন্য কথা শুনি বরং, বলো।

তত্ত্ব নয় মানুষ আসল, অথচ নানা বিদ্রোহ-বিপ্লবের উচ্ছ্বাস থিতিয়ে যাওয়ার পর তত্ত্বে জোর পড়েছে বেশি—মানুষে নয়, তাই তখন বিপ্লবের পিছু পিছু এসে গেছে—

কী?

কী বলে—মানে নতুন তত্ত্বটাকে পুরনো পাজি মানুষজন দিব্যি একটা নতুন খাঁচা বানিয়ে ফেলেছে।

প্রতিবিপ্ল ;?

হ্যাঁ।

একথাটাও সোজা-সরল কথা নয়, তবে খুব কিছু ভারি নয় এই যা!

বলতে বলতে আজ অনেকদিন পর আবার ঝিরঝির হেসে ফেলতে পারে নির্ঝর।

সে যা হোক—আমার কথা ফুরোয়নি এখনও।

বলো, বলো।

যে মানুষ ভালোবাসতে জানে না, সংকীর্ণ হিংসুক, যে গভীর প্রেমিক নয়, সে কোনো বর্তমানকেই মহৎ ভবিষ্যতে নিয়ে যেতে পারে না, তাই—

তাই?

শ্রেণীচেতনার সঙ্গে যদি এই মানবিক গুণগুলোর প্রতি জোর দেওয়া না হয় তবে সবই ছাইতে ঘি, তাই না? কী বলো?

চুপ করে থাকে নির্ঝর। জেঠু চলে গেল, ভোলা হারিয়ে গেল—তার সকাল-সন্ধে থেকে কে যেন প্রাণ শুষে নিয়েছিল। সমস্ত শরীর-মন শুকিয়ে গিয়েছিল তার। আজ এই সন্ধ্যায় অবৃষ্টির শীতল হাহাকার ছাপিয়ে যেন ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে। সুরমার শরীর থেকে কেমন এক সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে। তপ্ত রুক্ষ মাটির ওপর বৃষ্টিফোঁটা ছড়িয়ে পড়ছে। ঘুম নেমে আসতে চাইছে নির্ঝরের চোখ জুড়ে, যে ঘুম জাগরণের অধিক।

কিরু?

বলো।

পৃথিবীতে নিঃসঙ্গতা সত্যি, সত্যি নিষ্ঠুরতা কিংবা পচা শবের গন্ধ—তবু এসব ছাড়িয়েও সত্যি হয়ে জেগে থাকে মমতা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, স্বপ্ন। তা না হলে—

কী?

কেন এখানে আমরা দুজনে এভাবে পাশাপাশি—মনের আলো-ছায়া বৃষ্টি-অবৃষ্টির ভিতর একসঙ্গে মিশে যেতে চাইছি।

সত্যি বলে কিছু নেই, মিথ্যেও নয়—শুধু এক ধূসর এলাকা, মানুষ হাঁটে, প্রশ্ন করে, গন্তব্যে পৌঁছে দেখে এ তার স্বপ্নভূমি নয়, আবার পথ চলে।

সত্যি-মিথ্যে খোঁজার চেষ্টা তো সত্যি?

হয়তো তাই। জান, আমি বড়ো অবিশ্বাসী। ঈশ্বর বল, সমাজ-বিপ্লবের গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বল, কোনো কিছুতেই স্থির ধ্রুব বিশ্বাস নেই আমার। জীবনপথে চলার কোনো ছক নেই। প্রতিদিন জেনে শিখে বুঝে অনুভব করে হাতড়ে হাতড়ে হৃদয়ের চেতনার আলো-ছায়া বৃষ্টি-অবৃষ্টিতে পথ তৈরি করে নিতে হয়।

লেখো এই সব কথা।

একবার ভেবেছিলাম—না থাক।

কী? বলো।

পারব কি না জানি না।

ওহ্, বলো দেখি, ভণিতা রাখো।

সুজনডাঙা নিয়ে, নিজেকে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে, জেঠু-মা সবাইকে নিয়ে, আমার প্রশ্ন অনুভব কল্পনা মিশিয়ে একটা উপন্যাস লিখব।

চমৎকার! আজই শুরু করে দাও। বাড়ি ফিরেই লিখতে বোসো।

সে-উপন্যাসে দেশভাগের কথা আসবে—দাদুমণির ডায়েরিতে লেখা সেইসব যন্ত্রণা, উপলব্ধির কথা আসবে। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হল দেশ, কেন? এতে নাকি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ সমস্যার সমাধান হবে, আজ কী হল? এই দু'হাজার দুই সালে গোটা দেশের দিকে তাকালে ভয় হয়, শিউরে উঠি। মনে হয় তবে কি স্বাধীনতার যোগ্য নই আমরা? পশ্চিমবঙ্গ গুজরাট নয় এটা ঠিক, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা বিদ্বেষ—সুজনডাঙাতে একটা রাস্তার নামকরণ করা নিয়ে কীভাবে ভাগ হয়ে গেল মানুষ হিন্দু-মুসলমানে। জেঠুর সঙ্গে ধর্ম নিয়ে খুব তর্ক হত। ভাবতাম ধর্ম এসে ভারত ভাঙল, তবু জেঠু কেন এত ধার্মিক? ধর্মে সমন্বয়ের শক্তি বড়ো না বিভেদের?

সে তর্ক নেই আজ? অন্যরকম ভাবছ?

না, তা ঠিক নয়। আসলে জেঠুর ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা সাধারণভাবে যে আনুষ্ঠানিক

ধর্মের চেহারা আমরা দেখি তার থেকে আলাদা। জেঠু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে সেভাবে জোর দিতেন না। তিনি জানতেন তাঁর মৃত্যুর পর ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে শ্রাদ্ধ-শান্তি করব না আমি। সে নিয়ে কোনো ক্ষোভ ছিল না তাঁর। মৃত্যুর ক'দিন আগে ধর্ম নিয়ে কথা বলতে বলতে ভাগবতের একটা শ্লোক বললেন, ব্যাখ্যা করলেন।

কী শ্লোক?

শ্লোকটা সংস্কৃতে হল—অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো—না, সংস্কৃতে ঠিক মনে নেই আর, বাংলা মানে হল, সর্বভূতে যথাযথভাবে অন্নাদির সম্যক বিভাগও ধর্ম।

বাঃ!

জেঠুর কাছে ধর্ম মানে হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়। একজন খাবে আর অন্যজন না খেয়ে থাকবে, একজন খাটবে আর অন্যজন আরাম করবে, একজনের হাড়ভাঙা খাটুনির ফল চুরি করে অন্যজনে বিলাস করবে—এ চলতে পারে না, চলা উচিত নয়। সকল মানবধর্মের, মানবতার দিকনির্দেশ এটাই। জেঠু বলতেন, বুদ্ধদেব বা শ্রীচৈতন্য এঁরা তাঁদের যুগে দাঁড়িয়ে সে সময়ের সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও প্রতিবাদী মানুষের হয়ে এই বৈষম্যের প্রতিবাদ করেছেন— ধর্মের মানবিক মুখ এটাই।

ঠিক বলতেন।

না, শুধু এটুকুতেই ঠিক বলা যায় না। এটুকুতেই আধুনিক যুগে ধর্ম বা ধর্মের মানবিক মুখের প্রয়োজনীয়তা মেনে নেওয়া যায় না।

তবে?

কোল থেকে মাথা সরিয়ে উঠে বসে নির্ঝর। সুরমা লক্ষ্য করে ভাবনার আনন্দে চিন্তার আনন্দে প্রশ্নে সংশয়ে তাঁর চোখজোড়া কেমন জ্বলজ্বল করে উঠছে।

নির্ঝর বলে, আমি যেভাবে বুঝেছি জেঠুর কথা—ধর, বৈষম্য থাকা উচিত নয় একথা বহুবার বলা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হয়েছে, কিন্তু কীভাবে কোন্ পথে এ বৈষম্যের শেষ হয় সেটার খোঁজ দেওয়াই তো আসল—সে পথ দেখাতে সাহায্য করে কি ধর্ম? নাকি নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস হয়েই থেকে যায়, সবকিছু ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করে মেনে নিতে বলে মানুষের এই দুর্দশাকে? ভাবছি—বুদ্ধদেব বা শ্রীচৈতন্য তাঁদের মতো করে পথেরও খোঁজ দিয়েছিলেন। তাঁরা সেক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের চেতনা শুভবোধকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমরা জানি পথ যতই ভিন্ন হোক না কেন আধুনিক পৃথিবীতে অর্থনীতি-রাজনীতির নানারকম সংঘাত, জটিল অঙ্কের সমাধান ছাড়া প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন সম্ভব নয়, তা হলে? জেঠু বলেছেন, ওই রাজনীতি-অর্থনীতি প্রয়োগ করবে যে-মানুষ সে-মানুষ যদি শুভচেতনা শুভবোধে আলোকিত হয়ে না উঠতে পারে তবে

সব চেষ্টাই ব্যর্থ। আর এখনও এই আলোকিত করার কাজে ধর্মের একটা পজিটিভ ভূমিকা রয়ে গেছে। সে ধর্মবোধ নিতান্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ করে বৈরাগ্যসাধন বা নির্জন হিমালয়ে তপস্যা বা বিধর্মীকে পুড়িয়ে মারা নয়—সে-ধর্ম এক বোধ, এক আধ্যাত্মিক বোধ, যে-বোধের কেন্দ্রে ঈশ্বরবিশ্বাস থাকা না-থাকা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা মানবকল্যাণের আদর্শ, ক্ষুদ্র আমি ছাড়িয়ে বৃহৎ আমি-তে উত্তীর্ণ হওয়া।

সুরমা কেমন এক মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল নির্ঝরকে। তার বোধ হল ঘরের ভেতর শান্ত অথচ প্রাণবন্ত এক স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ছে। কথা শেষ করে নিজের ভেতরেই যেন ঘুরপাক খাচ্ছে নির্ঝর। খুঁটিয়ে দেখল সুরমা, ভেতরে কি তোলপাড় হচ্ছে নির্ঝরের? অথচ যখন কথা বলছে তখন তাতে অস্থিরতার চিহ্ন নেই। প্রাণ আছে বোধ আছে হৃদয়ের আলো আছে। সুরমা বলল, তারপর?

অ্যাঁ? কী? ঘোরের ভেতর থেকে যেন উঠে আসে নির্ঝর।

বলো, যা বলছিলে।

ভাবছিলাম জেঠুর কথাগুলো—ধর্মের বদমাইশির বিরুদ্ধে এদেশে চার্বাকের মতো মানবদরদী বস্তুবাদী দার্শনিকরা ছিলেন, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ কিংবা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে পুরোহিততন্ত্রকে মান্য করে নেওয়া—এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এঁরা, কিন্তু এই বদমাইশির দিক ছাড়াও যুগে যুগে ধর্মের যে অন্য মুখ, সে মুখই আজও দেখতে চান জেঠু। জেঠু বলতেন, যন্ত্র প্রযুক্তি আর ভোগসর্বস্বতার এই যুগে—সে পুঁজিতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র যাই হোক না কেন—যুগোপযোগী নতুন মানবধর্ম চাই, রাজনীতি-অর্থনীতির পরিবর্তন হবে আর ধর্মের হবে না? শ্রেণীচেতনার সঙ্গে যে ধর্মবোধে থাকবে গভীরতর আধ্যাত্মিক ভাবনা। আদিম মানুষের যে ভয় বিস্ময় থেকে ধর্মভাবনার সূত্রপাত, মানুষ যতই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অগ্রসর হোক না কেন—মৃত্যুভয়, বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যে বিস্মিত থেকেই যাবে মানুষ। ভোগলিপ্সা হৃদয়হীন করবে মানুষকে আর তাই হৃদয়ের খোঁজে মানুষকে আসতেই হবে নতুন যুগের নতুন ধর্মের কাছে। সেদিন শেষ বিকেলের আলোয় জেঠু আবৃত্তি করছিলেন মার্কণ্ডেয়পুরাণের একটা শ্লোক—ন ত্বহম্ কাময়ে রাজ্যম্—আমি রাজ্য কামনা করি না, চাই না স্বর্গ পুনর্জন্ম, শুধু চাই দুঃখতপ্ত সকল প্রাণীর আর্তির অবসান হোক। আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতি এবং ধর্মভাবনা যেন দুঃখী মানুষের আর্তির অবসান ঘটানোর কাজের সঙ্গে মিলতে পারে—জেঠুর ভাবনা এভাবেই বুঝেছি আমি।

জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল নির্ঝর। বাইরে অন্ধকার। ঢাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। এই সন্ধ্যা যেন এক ঘুমন্ত নিবিড় নিশীথের ভেতর ঢুকে পড়েছে। মানুষের তৈরি সময়ের হিসাব হারিয়ে গেছে, স্থির হয়ে আছে সময়, শুধু জেগে আছে পৃথিবীর অন্ধকার, দুটি মানব-মানবী আর তাদের মাঝখানে এসে বসেছেন কমলেশ।

চা খাবে? বোসো, করে নিয়ে আসি।

থাক এখন।

ওঠে না সুরমা। নির্ঝরের অনুভবের ভাগ নিতে চাইছিল বুঝি সে। চোখ পড়ল দেওয়ালে। দুটো টিকটিকি কেমন জড়াজড়ি করে আছে।

কাল গভীর রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল—

বলো।

আমরা সবাই তো এই মহাবিশ্ব বা বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে, ধ্বংস করে বাঁচবে না মানুষ, প্রকৃতির সন্তান হিসেবে, সমগ্রের অংশ হিসেবে বাঁচতে হবে তাকে। আর মনে হয় তুমি জান আমার কোনো ঈশ্বরবিশ্বাস নেই, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির অংশ হিসেবেই আমার চৈতন্য নিশ্চয় কোনো এক মহাচৈতন্যেরই অংশ। এই যে বর্ষা যায় শরৎ আসে, শরৎ যায় হেমন্ত আসে, সূর্য ওঠে অস্ত যায়—সবকিছু কেমন এক নিয়ম মেনে—কেমন এক শৃঙ্খলা সংহতি—এসব কি এক মহাচৈতন্যের পরিচালনা নয়? অস্বীকার করতে অবিশ্বাসী সংশয় জাগে। রবিঠাকুরের একটা গান আছে না- --এই যে তোমার আলোক-ধেনু সূর্য তারা দলে দলে/কোথায় বসে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগন তলে—গানটা কেমন গুনগুনিয়ে উঠছিল ভেতর থেকে।

অবিশ্বাসী হয়ো না। বরং—

কী?

ওই যে তোমার অনুভূতি, ওই যে নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির অংশ হিসেবে মহাচৈতন্যের অংশ হিসেবে ভাবা—বরং ভাবো ওই তোমার না-ঈশ্বরে বিশ্বাস।

সুরমা!

কী?

বিশ বছর আগে কেন দেখা হল না আমাদের?

হয়তো দেখা হয়নি বলেই জীবন এত সুন্দর, এত রহস্যময়!

সুরমা!

সামাজিক স্বীকৃতি-অস্বীকৃতিতে কী এসে যায়? আমাদের বন্ধুত্ব আমাদের ভালোবাসা—এটাই বড়ো কথা। বিশ বছর আগে দেখা হলে এই বয়েসে এসে হৃদয়ের আলো-ছায়ায় পরস্পরকে যেভাবে চিনেছি জেনেছি হয়তো সেভাবে সেই আলো-ছায়া নাও থাকতে পারত।

আমার ভেতর থেকে, সত্যি সত্যি মনের একেবারে গভীরতম জায়গা থেকে একটা নিবিড় ইচ্ছে উঠে আসছে।

শুনে সুরমা যেন একটু কেঁপে ওঠে। স্বরেও কি সে কাঁপন ধরা পড়ে? বলে, কী ইচ্ছে?

একটু আগে যা বলছিলাম—সুজনডাঙা নিয়ে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে, নিজের সব কল্পনা অনুভব নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব আমি।

সুরমা বুঝি অন্য কোনো ইচ্ছার কথা আশা করেছিল। তবু এ ইচ্ছাতেও আশাহত হয় না সে। কেমন এক নিবিড় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, বেশ তো লেখো, আজই শুরু করো।

আমি কি পারব? উপন্যাস কী, কাকে বলে উপন্যাস, আমি তার কতটুকু জানি!

জানার কোনো শেষ নেই। সব জেনে কিছু শুরু করতে চাইলে কোনোদিন শুরু হবে না। তাছাড়া, তুমি ভালো পড়ুয়া, দেশ-বিদেশের কত ভালো ভালো উপন্যাস পড়েছ তুমি, তার মধ্য দিয়ে উপন্যাস সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে তোমার।

হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। তবে উপন্যাসের একটি মাত্র ধরন নয়, নানা ধরন। বলা যায় যখনই উপন্যাসের একটা সংজ্ঞা তৈরির চেষ্টা হয়েছে তখনই তা ভেঙে নতুন কোনো স্রষ্টা নতুন এক ধরন তৈরি করেছেন। ধরো, ই. এম. ফস্টার যখন উপন্যাসের সংজ্ঞায় সেই ১৯২৭ নাকি ২৮ সালে বলছেন যে, উপন্যাসে বাস্তব জীবনের বর্ণনা থাকবে, কাল পরম্পরায় ঘটনা বিন্যস্ত হবে বা ঘটনার কার্যকারণ শৃঙ্খলা থাকবে, তখনই নতুন রীতির উপন্যাস লিখতে শুরু করে দিয়েছেন জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফরা।

পড়তে পড়তে শেখা একটা ধাপ, তারপর লিখতে লিখতে শেখা—শুরু করে দাও।

বাংলা উপন্যাসেরও কত বিচিত্র ধরন—গোরা ও চতুরঙ্গ, আঙ্গিক গঠনরীতিতে কত আলাদা। জাগরী এবং ঢোঁড়াইচরিতমানস কিংবা ধরো পথের পাঁচালীর স্রষ্টা যখন আরণ্যক লেখেন তা আবার অন্য এক ধরন।

তুমি কি ভেবেছ কিছু? মানে কীভাবে গড়ে তুলতে চাইছ উপন্যাসটাকে? উপন্যাসের বিষয়টা তো নির্দিষ্ট করেছ।

দেখো, উপন্যাসের বিষয় বলে কি আলাদা করে নির্দিষ্ট করা যায় কিছু? সুজনডাঙায় এই যে জীবনপ্রবাহ, ব্যক্তির অস্তিত্ব ঘিরে কিছু জিজ্ঞাসা, নানা মানুষের সুখ দুঃখ বোধ উপলব্ধি জীবনধারা, প্রবহমান নানা চেতনাবিন্দুকে চিহ্নিত করব আমি, তাতে মিশবে আমার কল্পনা আর অনুভব।

বাঃ!

সুজনডাঙার নানা মানুষের চেতনার হৃদয়ের বৃষ্টি-অবৃষ্টির একটা বিবরণ হয়ে উঠবে তা—যার শুরুও নেই, শেষও নেই।

নিরু!

হুঁ।

ওঠো, শুরু করে দাও আজই।

আজই?

হ্যাঁ, আজ বাড়ি ফিরেই। তোমায় একটা সুন্দর কলম দিচ্ছি আমি। ওই কলমে লিখবে।

সে কলমে—

কী?

যদি সবার কথা ছাপিয়ে গিয়ে তোমার কথাই সবচেয়ে বেশি করে বেজে ওঠে?

উঠুক। উপন্যাস তাতে ভালো বৈ মন্দ হবে না।

কিন্তু—

কিন্তু কী?

জেঠুর আয় বন্ধ হয়ে গেল সংসারে। মায়ের আয় আর কিছু জমানো টাকা—এভাবে চলবে না। পেট চালাতে কিছু করতে হবে।

কী করবে? প্রুফ-রিডিং?

না, ও আর ভালো লাগে না। দেখি, ভাবতে হবে। ও হয়ে যাবে একরকম।

সে যাই কর, উপন্যাসটা লিখে ফেলতে হবে তোমায়।

চেষ্টা করব। আরও একটা ইচ্ছা।

কী?

রেলবস্তির মানুষদের নিয়ে কিছু কাজ করতে চাই। বাউণ্ডুলেপনা করে তো কাটল এত বছর, এবার না হয়—

খুব ভালো কথা। কিন্তু উপন্যাসের কথা ভুলো না।

উপন্যাস লেখার কী হবে না হবে জানি না, কিন্তু রেলবস্তির মানুষজনাকে নিয়ে কিছু একটা—ভোলার ছেলে-মেয়ের কথাও ভাবা উচিত আমার।

কী কাজ করবে বস্তির লোকদের নিয়ে? এন. জি. ও. খুলবে?

না-না, এন. জি. ও. নয় ঠিক, মানে ধরো, ওদেরকে সংগঠিত করা। ওরা ওদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে মুখ খুলুক, পথ খুঁজুক, আমি সঙ্গে থাকব। কিন্তু তা বলে এই নিয়ে বিদেশি অর্থসাহায্য বা বড়ো বড়ো কোম্পানির দয়ার দান খুঁজে বেড়াব, তা নয়।

কিন্তু তুমি ওদের দয়া করতে চাইছ, নাকি?

তা কেন? একটা কথা কী জান, বস্তির ওই মানুষগুলো, যতটা মিশেছি আমি, আর যাইহোক—তোমার আমার মতো তথাকথিত শিক্ষিত না হতে পারে কিন্তু ভণ্ড নয়। ওদের সঙ্গে থেকে আমি নিজেকে শুদ্ধ করতে চাইছি, যদি পারি। কলকাতা তার পেটের ভেতর যতই গিলে নিচ্ছে সুজনডাঙাকে—তার নাগরিক মধ্যবিত্ত ততই যেন—একটা পচা গন্ধ সুজনডাঙার বাতাসে—বড়ো বেশি লোভ আর ভণ্ডামি—

একা নামতে চাও কাজে?

মানে? একা কেন? সঙ্গে বস্তির বাইরের কেউ যদি থাকতে চায় স্বেচ্ছায় থাকবে।

বাউণ্ডুলে নিরুবাবু তাহলে এখন থেকে আর শুধু ভাবুক থাকছেন না, কাজের মানুষ হয়ে উঠছেন!

দেখো, জেঠু ভাবতেন আবার কাজও করতেন। কী অসম্ভব পরিশ্রমী কর্মী মানুষ!

প্রশ্ন নেই তা হলে? সংশয় নেই?

কেন থাকবে না—যার সংশয় নেই প্রশ্ন নেই সে তো অন্ধ, মৃত। পথ হাঁটতে হবে, হাঁটতেই হবে, গন্তব্যের স্বপ্ন থাকবে বুকে।

নেবে আমায় তোমার সঙ্গে?

যদি বলি আমি নেবার কে?

তুমি আমার সখা। সংসারের প্রয়োজনের বাইরে যেখানে শুধু সুরমা নামের নারীটি তার একান্ত সত্তা নিয়ে বেঁচে উঠতে চায়, তুমি সেই স্পষ্ট-অস্পষ্ট সবুজ ঘাসের মাঠে হাত বাড়িয়ে দেওয়া বন্ধু। তুমি সঙ্গে নেবে না তো কে নেবে?

বলতে বলতে আবেগে গলা বুজে আসছিল সুরমার। চোখের কোলে কি বৃষ্টিবিন্দু? সে বৃষ্টিফোঁটায় কি কোনো শুভ্র মানবিক ভোরে ভৈরবীর সুর জেগে উঠছিল?

বৃষ্টি নামল বাইরে। নির্ঝরের মনে হল, অন্ধকারেও সে বৃষ্টির কত রং, কত রকমের গান জানে সে বৃষ্টির শব্দ, কত রকম ছন্দে কত নাচ জানে!

এই সন্ধ্যা যেন এক স্থিরচিত্র হয়ে আছে। স্থির হয়ে আছে মানুষের তৈরি সময়। অবৃষ্টির শীতল হাহাকার ছাপিয়ে কেমন এক স্নিগ্ধ আলোর মতো সারা সুজনডাঙায় ছড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির আশ্চর্য সুর!

নির্ঝর ডাকল, সুরমা!

সাড়া নেই কোনো।

সুরমা!

বলো, কাঁপা গলায় বহুদূর থেকে যেন ভেসে এল সে শব্দ।

শুনতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ।

দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ।

বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি—বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় আশ্চর্য সুরের মতো কী জন্ম নিতে চাইছিল তরুণ ভাস্করের হাতে-গড়া কোনো মিথুন মূর্তি?

তারপর—সন্ধে গড়িয়ে রাত, রাত গড়িয়ে দিন, আবার দিন থেকে রাত। সময় বয়ে যায়, কত রঙের বৃষ্টি-অবৃষ্টি নিয়ে বয়ে যায় জীবন।